বাংলাদেশে সুশাসন; সমস্যা ও সম্ভাবনা ঃ

ঝাওয়াইল ইউনিয়ন, একটি তৃণমূল সমীক্ষা

এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

403783

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
এম. সাইফুল্লাহ ভূইয়া
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

উপস্থাপনায়
নাছিমা সুলতানা
এম.ফিল. ২য় বর্ষ
রেজিঃ নং -৩৮০
শিক্ষাবর্ষ ১৯৯৮-১৯৯৯
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Library
403783

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা ও বাবাকে

403783

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন পত্র

নাছিমা সুলতানা -এর 'বাংলাদেশে সুশাসন ; সমস্যা ও সম্ভাবনা:ঝাওয়াইল ইউনিয়ন একটি তৃণমুল সমীক্ষা ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের এম. ফিল ডিগ্রীর আংশিক পরিপূরক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন দেওয়া হল।

403783

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

তারিখঃ 29-12-2004

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

এম. সাইফুল্লাহ ভূইয়া

অধ্যাপক , রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদালয়

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

চূড়ান্তরূপে সম্পাদিত একটি গবেষণাকর্ম বাস্তবিকই সমবায়ী প্রয়াসের ফসল । এ সমবায়ী প্রয়াসে সম্পৃক্ত থাকে সমীক্ষা এলাকার তথ্যদাতা , সংগঠন , বিভিন্ন ব্যক্তি , প্রতিষ্ঠান , গ্রন্থগার কর্তৃপক্ষ ও লেখক সমাজ । এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনে যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সামান্যতমও সহযোগিতা আমি পেয়েছি , তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি , অধ্যাপক এম. সাইফুল্লাহ ভূইয়া,যিনি আমার গবেষণার তত্ত্বাবধান করেছেন, গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে নিরবচ্ছিন্ন উৎসাহ -আগ্রহ , মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়ে বিষয়বস্তুর ব্যাখা বিশ্লেষনের কাজটি সহজ সাধ্য করেছেন।

বিভাগীয় প্রধান আমার গবেষণা প্রস্তাবনা অনুমোদন করে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তিনি দ্রুত কাজ সম্পাদনের জন্যে তাগাদা দিয়েছেন এবং নৈতিক সহযোগিতা দিয়ে গবেষণাকর্মটিকে সম্ভব করে তুলেছেন। আমি তার প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক নজরুল ইসলাম , গবেষণাকর্মে উৎসাহ - অনুপ্রেরণা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে আমার দুর্ভার কাজের বিষয়ে উদ্বিগ্নতা লাঘব করেছেন। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমি অনেক প্রতিষ্ঠানের সযত্ন সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। বিশেষ করে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলসমুহের সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP),সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (CPD), বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS),গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার (CDL), সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড পিস স্ট্রাডিজ (CSPS),বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC), পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (PIB),বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিস, গ্রামীণ ট্রাষ্ট গ্রন্থাগার, নারী

Dhaka University Institutional Repository

প্রগতি সংঘ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, লোকপ্রশাসন বিভাগের সেমিনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণাধীন গোপালপুর উপজেলার বিভিন্ন কার্যালয়ের কর্মকর্তা এবং ঝাওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাদের অনেকেই অফিসের মূল নথিপত্র ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন, তাদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

তৃণমূল পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহে উদার সহযোগিতার জন্যে আমি মীর মাছুম আলী , মীর লিয়াকত আলীর প্রতি কৃতজ্ঞ । আরো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঝাওয়াইল ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের কাছে যিনি অবলীলায় আমাকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন, সহজাত আতিথ্যে বরণ করেছেন । আমি সমীক্ষাধীন এলাকার অধিবাসীদের কাছে অত্যন্ত ঋণী । তাদের বিচিত্র জ্ঞানের অংশীদারিত্বে , অজানা জ্ঞানের উন্মোচনে আমার গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনে ,যে উদার সহযোগিতা ও সময় তারা দিয়েছেন সে জন্য আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

মৌলিক গবেষনাকর্মের পঠন - পাঠনের প্রতি আমার আগ্রহ বরাবরই ছিল । আমার গবেষণার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত চিন্তার গঠনে, ভাবনার বিচিত্রতা ধারণে , ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও মুল্যায়নে প্রাসঙ্গিক যাদের রচনা সম্ভারের সহায়তা নিয়েছি, আমি তাদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার পারিবারিক পরিমন্ডলের অব্যাহত তাগাদা, গবেষণার প্রতি আমাকে নিবিষ্ট রেখেছে। আমার বাবা মীর আব্দুল মোতালেব 'গবেষণার দৈব দুর্বিপাকে ' কান্ডারীর ভূমিকা পালন করেছেন। শোভন ও চয়ন যাদের হাতে কম্পোজের পুরো দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলাম তাদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। গবেষণা কাজে বিভিন্ন সময় আগ্রহ , উৎসাহ প্রদান ও সহযোগিতার জন্য আমার ছোট ভাই মীর বোরহান উদ্দিন , ছোট বোন তানমি আক্তারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'বাংলাদেশে সুশাসন ; সমস্যা ও সম্ভাবনা' সমীক্ষার ভিত্তিতে উপস্থাপনা আমার পক্ষে ' ছোট ফ্রেমে বড় ছবি' প্রতিস্থাপনের মতই কঠিন ছিল। আমার গবেষণা কর্মটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করার সযত্ন প্রয়াস ছিল। তবুও গবেষনাকর্মে দৃষ্ট সীমাবদ্ধতা ও অগোচরে রয়ে যাওয়া ত্রুটির দায়দায়িত্ব একান্তই আমার।

নাছিমা সুলতানা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা নির্যাস

আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে পরিগঠন ও বিন্যস্ত করা জরুরি যাতে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়। একটি দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার উপরই নির্ভর করে সুশাসনের কার্যকারিতা । উন্নয়নশীল দেশ গুলোতে সুশাসন প্রত্যয়টি অধুনা বহুল আলোচিত বিষয় । কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার জন্য সুশাসনের কোন বিকল্প নেই। সভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর হানটিংটনের ভাষায় যে 'তৃতীয় ঢেউ' গোটা বিশ্বকে টালমাটাল করে তুলেছে তা হচ্ছে-" গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রায়নের প্রপঞ্চ"। গণতন্ত্রকে অর্থবহ ও কার্যকর করে তুলতে হলে এবং গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও সুস্থ পদ্ধতিতে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে হলে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ ভাবে সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক ধরণের মৌলিক চুক্তি। যে শাসনতন্ত্র নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেনা এবং শাসন ব্যবস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলীর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করেনা সে শাসনতন্ত্র শুধু যে অকার্যকরই হবে তাই নয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত তা অনিয়মতান্ত্রিকতারও জন্ম দিতে পারে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সুশাসন নিশ্চিত করার তেমন কোন পরিস্থিতি নেই বললেই চলে। কেননা এখানে শাসন ব্যবস্থা বিশৃংখলা, অরাজকতা ও দূর্নীতি রাষ্ট্র ও সমাজ দেহে এক দুঃসহ অবস্থার জন্ম দিয়েছে। ফলে সুশাাসন শুধু নয় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এক বিরাট Casualty হয়ে পড়তে বাধ্য । সুশসানের এই সমস্যা গুলোকে সরকার , রাজনৈতিক দল সমূহ ও সমাজ মনস্ক ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে সমাধানের একটি প্রকল্প হাতে নেয়া জরুরী। সুশাসনের Mecanism evolve করার স্বার্থে সুষ্ঠু রাজনৈতিক কৃষ্টিকে Foster করা অত্যাবশ্যক। এদিক থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকলেও মন্থর ও ধীরে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

আমাদের গবেষণায় বিভিন্ন অধ্যায়ে সুশাসনের বিষয়টি আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে এবং এর বিভিন্ন মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে বিরাজমান সঙ্গতি ও অসঙ্গতিগুলো চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এছাড়া যে সব বিষয়ের ওপরে গুরুত্বের সঙ্গে আলোকপাত করা হবে সেসব হচ্ছে - রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব , সরকার পরিবর্তন / ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের পদ্ধতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের স্বরূপ , সরকারের জবাবদিহিতা ও প্রশাসনের স্বচ্ছতা, সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা , জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা , বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি ইত্যাদি।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সুশাসন প্রত্যয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত । তার পরও আমরা Primary ও Secondary Source এর ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করবো যে বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা থাকলেও এর সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী সমূহের তালিকা

সারণী ৩.১ - ৩.৫- তৃতীয় অধ্যায়- গবেষণা এলাকার পরিচিতি

সারণী ৫.১ - ৫.১৮ - পঞ্চম অধ্যায়- বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টি, সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

সারণী ৬.১ - ৬.৩৩ - ষষ্ঠ অধ্যায়- বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের স্বরূপ ও সরকারের জবাবদিহিতা

সারণী ৭.১ - ৭.২০ - সপ্তম অধ্যায়-ক্ষমতার পরিবর্তন/ ক্ষমতার শান্তি পূর্ণ হস্তান্তর পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র - ১
টাঙ্গাইলের অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়সূচী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার		I-II
গবেষণা নির্যাস		III-IV
সারণীসমূহের তালিকা		V
মানচিত্র		VI-VII
প্রথম অধ্যায়		১-১২
১.১	ভূমিকা	২
১.২	বিষয়বস্তুর বর্ণনা	২
১.৩	গবেষণার উদ্দেশ্য	৩
১.৪	অনুমান গঠন	৩
১.৫	গবেষণার যৌক্তিকতা	৪
১.৬	চলক নির্ধারণ	৪
১.৭	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও কৌশল	৭
১.৮	তথ্যের উৎস	৮
১.৯	নমুনায়ন	৮
১.১০	বিশ্লেষনের একক	৯
১.১১	গবেষণা এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা	৯
১.১২	গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৯
১.১৩	অধ্যায় বিন্যাস	১১
দ্বিতীয় অধ্যায়		১৩-২৬
পুস্তক পর্যালোচনা		

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়		২৭-৩৫
গবেষণা এলাকার পরিচিতি		
৩.১	অবস্থান	২৮
৩.২	আয়তন ও জনসংখ্যা	২৮
৩.৩	যাতায়াত ব্যবস্থা	২৮
৩.৪	হাটবাজার	২৮
৩.৫	শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	২৯
৩.৬	রাজনৈতিক অবস্থা	২৯
৩.৭	অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা	২৯
৩.৮	উত্তরদাতাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি	৩১
তথ্য নির্দেশিকা		৩৬
চতুর্থ অধ্যায়		৩৭-৬২
বাংলাদেশে সুশাসন ; সমস্যা ও সম্ভাবনা		
৪.১	সুশাসনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ধারা	৩৮
৪.২	সুশাসন	৪২
৪.৩	সুশাসনের বৈশিষ্ট্য	৪৬
৪.৪	বিভিন্ন ধরণের সুশাসন	৪৮
৪.৫	অপশাসন ও তার বৈশিষ্ট্য	৫২
৪.৬	বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা	৫৩
৪.৭	বাংলাদেশে সুশাসনের সম্ভাবনা	৫৬
তথ্য নির্দেশিকা		৫৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ৬৩-৯৭

বাংলাদেশের জনগনের রাজনৈতিক কৃষ্টি , সর্বস্তরের জনগনের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

৫.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণার বিকাশ ৬৫

৫.২ বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ ৬৬

৫.৩ গ্রামীণ জনগনের রাজনৈতিক কৃষ্টি ৭৫

৫.৪ সর্বস্তরের জনগনের রাজনৈতিক সচেতনতা ৮০

৫.৫ সচেতনতার ব্যাপ্তি ৮৪

৫.৬ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা ৮৮

তথ্য নির্দেশিকা ৯৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ৯৮-১৩৩

৬.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধরণ ৯৯

৬.২ রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণাবলী ১০১

৬.৩ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা ১০৯

৬.৪ নারী নেতৃত্ব ১১০

৬.৫ প্রার্থী নির্বাচনে নির্ধারক ১১২

৬.৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের স্বরূপ ১১৬

তথ্য নির্দেশিকা ১৩৩

সপ্তম অধ্যায় ১৩৪-১৬৫

৭.১ বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতির সংস্কৃতি ১৩৫

৭.২ সরকার পরিবর্তন /ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ(গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়)

ক. গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

খ. অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ১৪৮

গ. রাজনৈতিক বিশ্বাস ১৫১

ঘ. সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য ১৫৬

তথ্য নির্দেশিকা ১৬৩

অষ্টম অধ্যায় ১৬৬-১৭২

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

১.২ বিষয়বস্তুর বর্ণনা

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৪ অনুমান গঠন

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

১.৬ চলক নির্ধারণ

১.৭ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও কৌশল

১.৮ তথ্যের উৎস

১.৯ নমুনায়ন

১.১০ বিশ্লেষনের একক

১.১১ গবেষণা এলাকা নির্ধারণের যৌক্তিকতা

১.১২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

১.১৩ অধ্যায় বিন্যাস

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকা

সাম্প্রতিক কালে 'সুশাসন' প্রত্যয়টি আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বহুল আলোচিত একটি বিষয়। আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এমনভাবে পরিগঠন ও বিন্যস্ত করা জরুরী যাতে সুশাসন নিশ্চিত করা যায়। একটি দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার ওপরই নির্ভর করে সুশাসনের কার্যকারিতা। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 'সুশাসন' প্রত্যয়টি অধুনাবহুল আলোচিত বিষয়। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসুন্নত রাখার জন্য সুশাসনের কোন বিকল্প নেই। সভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির পর হানটিংটনের ভাষায় যে 'তৃতীয় ঢেউ' গোটা বিশ্বকে টালমাটাল করে তুলেছে তা হচ্ছে 'গণতন্ত্র' ও 'গণতন্ত্রায়নের প্রপঞ্চ'। গণতন্ত্রকে অর্থবহ ও কার্যকর করে তুলতে হলে এবং গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু ও সুস্থ পদ্ধতিতে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে হলে যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুশাসনকে নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণভাবে সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রকে পরিচালনার জন্য জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক ধরনের মৌলিক চুক্তি। যে শাসনতন্ত্র নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে না এবং শাসন ব্যবস্থায় গৃহীত সিদ্ধান্তাবলীর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে না সে শাসনতন্ত্র শুধু যে অকার্যকরই হবে তাই নয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত তা অনিয়মতান্ত্রিকতারও জন্ম দিতে পারে।

১.২ বিষয়বস্তুর বর্ণনাঃ

বর্তমান বিশ্বে যে বিষয়টি নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে তা হচ্ছে একটি দেশে সুশাসন স্থাপন। সাধারণ অর্থে সুশাসনের অর্থ এমন একটি আদর্শ শাসন ব্যবস্থা যা একটি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রণীত কার্যক্রমে যথাযথ জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেবে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিকসহ এর সাথে সংশিষ্ট সকল বিষয়ে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে আমরা সুশাসন বলতে পারি।

'সুশাসন' একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয়। এটি শাসন ব্যবস্থার সামগ্রিক দিক অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, লোক প্রশাসন, স্থানীয় ও জাতীয় শাসন, শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, প্রশাসনের দক্ষতা ও আইনের শাসন সহ জনকল্যাণমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আর তাই 'সুশাসন' প্রত্যয়টি বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের নীতি নির্ধারকদের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নব্বই দশক থেকে সুশাসন প্রত্যয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য রাষ্ট্রের চিরাচরিত ভূমিকার পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। একটি দেশের স্থানীয় পর্যায়ে যদি সুশাসন নিশ্চিত করা যায় তাহলে জাতীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব। আর তাই একটি দেশে সুশাসন নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা সুশাসনের বাধা গুলো চিহ্নিত করে তার সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের স্থানীয় পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থার ধরণ দেখে এবং তার আলোকে জাতীয় পর্যায়ে সুশাসনের অবস্থা জানার চেষ্টা করা যায়। তাই স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের অবস্থা জানা একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। আর তাই বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক (typical) ইউনিয়নে জরিপ চালিয়ে উক্ত বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। কাজেই এ গবেষণা বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের ধরণ; তার সমস্যা ও সমাধানের উপায় তুলে ধরতে পারবে বলে আশা করা যায়।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

তৃণমূল সমীক্ষার ভিত্তিতে বাংলাদেশে সুশাসনের বর্তমান অবস্থা, এর সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে সুশাসনের সম্ভাবনা যাচাই করাই ছিল এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে দেখা যায় সুশাসনের উপাদান গুলোর অনুপস্থিতি অত্যন্ত প্রকট এবং সুশাসনের উল্লেখিত বাধা গুলো সুস্পষ্ট। আর তাই এই গবেষণায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সম্ভাব্য উপায় পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

প্রধান উদ্দেশ্য ঃ

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ

১। বাংলাদেশের স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসনের ধরন নিরূপন করা।

২। সুশাসন স্থাপনের ক্ষেত্রে কি কি উপাদান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তা অনুসন্ধান করা।

১.৪ অনুমান গঠন

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের আয় নিম্ন পর্যায়ের , তাদের শিক্ষার হার কম, ধর্মীয় প্রভাব ও কুসংস্কার প্রবলভাবে কাজ করে। রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে গ্রামীণ জনগণ তেমনভাবে সম্পৃক্ত নয়। তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

অনুন্নত এবং প্রচার মাধ্যম সীমিত। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দক্ষতার অভাব, নেতৃত্বের সংকট, শান্তি পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতির অনুপস্থিতি, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, জাতীয় প্রচার মাধ্যম গুলোর দলীয় মনোভব সর্বোপরি বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টির সমস্যা রয়েছে।

উপরোক্ত অনুমানগুলো বর্তমান গবেষণার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং পুরো গবেষণায় এ অনুমান গুলোর সত্যাসত্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

সাম্প্রতিক ধারণা হিসেবে সুশাসন দাতা সংস্থা, সরকার, রাজনৈতিক দল এবং সিভিল সমাজের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। আর এই সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিন্যাসে যে বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে তা হল স্থানীয় উন্নয়ন ,অংশগ্রহনমূলক, গণমুখী, সমতাধর্মী ,স্বচ্ছ ও জবাবদিহিপূর্ণ ব্যবস্থার ধারণা। আর সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা, স্থানীয় উন্নয়ন, জনঅংশগ্রহন, ক্ষমতায়ন, স্বচ্ছতা, বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি মৌল ধারণাকে সমন্বিত করে শাসন ব্যবস্থার নতুন সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করা হচ্ছে । উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সুশাসন নিশ্চিত করার তেমন কোন পরিস্থিতি নেই বললেই চলে। কেননা এখানে শাসন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও দূর্নীতি, রাষ্ট্র ও সমাজদেহে এক দুঃসহ অবস্থার জন্ম দিয়েছে। ফলে সুশাসন শুধু নয় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এক বিরাট Casualty হয়ে পড়তে বাধ্য। সুশাসনের এই সমস্যা গুলোকে সরকার, রাজনৈতিক দলসমূহ ও সমাজ মনস্ক ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগে সমাধানের প্রকল্প হাতে নেয়া জরুরী । সুশাসনকে নিশ্চিত করার স্বার্থে সুষ্ঠু রাজনৈতিক কৃষ্টিকে Foster করা অত্যাবশ্যক। এদিক থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকলেও মন্থর ও ধীরে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে অদূর ভবিষ্যতে এদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে যদি সুশাসনের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা যায় তাহলে ভবিষ্যতে সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্ভব।

১.৬ চলক নির্ধারণ ঃ

প্রতিটি গবেষণাতেই ব্যবহৃত চলক গুলোকে চিহ্নিতকরণ ও নির্দিষ্টকরণ করা হয়। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে চলক গুলোকে নির্ভরশীল চলক, অনির্ভরশীল চলক ও নিয়ন্ত্রিত চলক হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত মূল ধারণা হচ্ছে 'সুশাসন'। বর্তমান গবেষণায় নির্ভরশীল চলক হচ্ছে ঃ

ক. সুশাসন।

খ. সুশাসনের সমস্যা।

গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায়।

Dhaka University Institutional Repository

ক. সুশাসন ঃ সাধারণ অর্থে সুশাসনের অর্থ এমন একটি আদর্শ শাসন ব্যবস্থা যা একটি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রণীত কার্যক্রমে যথাযথ জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেবে। বর্তমান বিশ্বের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিকসহ এর সাথে সংশিষ্ট সকল বিষয়ে দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে আমরা সুশাসন বলতে পারি।

বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনডিপি যৌথভাবে ঢাকায় সুশাসন বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করেছিলো । সেখানে ইউএনডিপি সুশাসনের দশটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে। যেমন-ঃ

১. অংশগ্রহণ
২. আইনের শাসন
৩. স্বচ্ছতা
৪. দায়িত্বশীলতা
৫. সমন্বয়ের প্রক্রিয়া
৬. নিরপেক্ষতা
৭. কার্যকারিতা ও দক্ষতা
৮. দায়বদ্ধতা
৯. স্ট্রাটেজিকভিশন
১০.শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা

সুশাসনের উপাদান ঃ

১. অবাধ, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা।
২. রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা।
৩. সংগঠিত হবার এবং অংশ গ্রহণের স্বাধীনতা।
৪. একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা।
৫. স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক আমলাতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

৬. সরকারী কাজের স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা

৭. আইনের শাসন।

৮. সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করা

৯. জনগণের অধিকার ও ন্যায় পরায়নতা ইত্যাদি।

খ. সুশাসনের সমস্যা/বাধাসমূহ ঃ

১. দূর্নীতি

২. আমলাদের অক্ষমতা/অযোগ্য আমলাতন্ত্র।

৩. প্রশাসনে রাজনৈতিক প্রভাব।

৪. স্বজনপ্রীতি

৫. আইনের শাসনের অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

গ. সুশাসন প্রতিষ্ঠার উপায় ঃ

১. স্বচ্ছতা।

২. জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা।

৩. মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহের নিশ্চিয়তা বিধান।

৪. আইনের শাসন

৫. ক্ষতার পৃথকীকরণ ও বিচার ব্যবস্থার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

৬. মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ নিশ্চিত করা।

৭. শক্তিশালী ও সুগঠিত জনসমাজ।

৮.জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা।

৯.উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

১০.সরকার গঠন, পরিবর্তন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক নিশ্চয়তা বিধান।

Dhaka University Institutional Repository

আর অনির্ভরশীল চলক গুলো হচ্ছে কতিপয় জনসংখ্যা সংক্রান্ত উপাদান ও সামাজিক উপাদান। এগুলো হচ্ছে ঃ ১. বয়স ২. শিক্ষা ৩. ধর্ম ৪. পেশা ৫. লিঙ্গ ৬. আয় ৭. বৈবাহিক অবস্থা ৮. গণমাধ্যম ইত্যাদি।

১.৭ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও কৌশল ঃ

ইউনিয়ন অধ্যয়নে ইউনিয়ন সম্পর্কে যথার্থ উপলব্ধি অর্জন গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক জীবনবোধের মানসিকতা গ্রামীণ জীবনবোধ উপলব্ধিতে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। আর তাই ইউনিয়নের গ্রামগুলো সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভের জন্য প্রয়োজন নিবিড় প্রত্যক্ষানুসন্ধান পদ্ধতি নির্ভর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। আর তাই গবেষণার জন্য নির্ধারিত ইউনিয়নে অবস্থান করে সার্বিকভাবে গ্রামীণ জনজীবন সম্পর্কে জানার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ইউনিয়নের গ্রামগুলোতে বিভিন্ন বাড়ীতে যেয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রভাবশালীদের সাথে আগে সাক্ষাৎ করে গবেষক আগে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের জানিয়েছে এবং তাদের দেয়া সময় অনুযায়ী পরবর্তীতে তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে।

বর্তমান গবেষণায় সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের (Questionnaire)মাধ্যমে সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (Direct interview) করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণা এলাকায় জরিপ চালিয়ে (Preliminary survey) গ্রামগুলোর পরিবারের সংখ্যা, সদস্যদের নাম, লোকসংখ্যা, বয়স, লিঙ্গ , শিক্ষা ,আয়, পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, গণমাধ্যম ব্যবহারের মাত্রা, ভোটার কিনা, শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করে তারপর প্রশ্নপত্র তৈরী করে তার ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে প্রশ্নপত্র এমন যে প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর গুলো নির্দিষ্ট উত্তরের মধ্যে আবদ্ধ (Closedended) । গ্রামের অভ্যন্তরে পায়ে হেঁটে বিভিন্ন বাড়ীতে পৌঁছে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কয়েকজনের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করে তাদের গবেষকের উদ্দেশ্য , কাজের ধরণ, সহযোগীতার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে তথ্য সংগ্রহ অনেক সহজ হয়। এছাড়া একজনের দেয়া তথ্য অন্যের কাছে গোপন করে অন্যের মাধ্যমে তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে।

১.৮ তথ্যের উৎসঃ

এই গবেষণায় প্রাথমিক ও গৌণ উভয় ধরনের উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যের প্রাথমিক উৎস ঃ

এই গবেষণাকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গবেষণার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সঙ্গতি রেখে তৃণমূল পর্যায়ে মাঠকর্মের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক উৎসের তথ্য (Primary Source) সংগৃহীত ও ব্যবহার করা হয়েছে। আর এ জন্য ঝাওয়াইল ইউনিয়নের মোট ১৮টি গ্রামের ৭২০ জন ব্যক্তির কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান পেশা কৃষি ছাড়াও অন্যান্য প্রায় সকল পেশার ব্যক্তি এবং নারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারের বাইরেও দরিদ্র নারী –পুরুষ, এনজিও কর্মী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, প্রকল্প কমিটির সভাপতি, গ্রামীণ সর্দার ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ আরও বিভিন্ন পেশার লোকদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা এলাকার লোকদের সঙ্গে বাজারে, পাড়ায় পাড়ায় অবস্থিত চায়ের দোকানে গল্পগুজব ও আড্ডা দিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে স্থানীয় জনগণের ধারণা ও মতামত জানা হতো।

তথ্যের গৌণ উৎস ঃ

এই গবেষণায় গৌণ তথ্যের জন্য বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে 'সুশাসনের সমস্যা ও সম্ভাবনা" এ বিষয়ে এবং গবেষণার সাথে সংশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের ওপর যেসব গবেষণামূলক কাজ হয়েছে (প্রবন্ধ, অনুশীলনপত্র, গ্রন্থ ইত্যাদি) সে সবের সহায়তায় এবং Indicators of good governance এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের বাস্তবতাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.৯ নমুনায়ন ঃ

ঝাওয়াইল ইউনিয়নটি প্রাথমিকভাবে জরিপ করে দেখা গেছে যে এতে ১৮টি গ্রামে মোট লোক সংখ্যা ৩৩, ৪৩০ জন (১৯৯১ সালের জরিপ অনুযায়ী)। ইউনিয়নটিতে মোট পুরুষ ১৬,৮৭৫ জন এবং মহিলা ১৬,৫৫৫ জন। এদের মধ্যে কেবলমাত্র ১৮ এবং তদুর্ধ্ব বয়সী জনসমষ্টিকে সমগ্রক হিসেবে গৃহীত হয়েছে। প্রতি গ্রাম থেকে বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত গড়ে ৪০ জন (নারী-পুরুষ) কে সরল নির্বিচারী (Simple random) পদ্ধতিতে নমুনা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। এদের নিকট থেকে সরাসরি এবং সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে এই ৭২০ জন ব্যক্তিই হল গবেষণার নমুনা আকৃতি (Sample size)। এদের মধ্যে ৬০০ জন পুরুষ ও ১২০ জন মহিলা। আকৃতির দিক থেকে এটাকে কাম্য আকৃতি (Optimum sample size) বলে অভিহিত করা যায়। কেননা সীমিত সময়ে ও একক প্রচেষ্টায় এরূপ সংখ্যক নমুনা নিয়েই সঠিকভাবে গবেষণা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১.১০ বিশ্লেষনের একক ঃ

গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে গ্রামীণ জনগণের নিকট থেকে। তাই এই গবেষণার বিশ্লেষনের একক হল নির্বাচিত ইউনিয়নের গ্রামগুলোর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিজন ব্যক্তি (individuals) যাদের বয়স নূন্যতম ১৮ বছর। তবে গৌণ উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষনের একক হচ্ছে বই পুস্তক, জার্নাল, প্রবন্ধ পত্রপত্রিকা ইত্যাদি।

১.১১ গবেষণা এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা ঃ

এই গবেষণার জন্য এলাকাটি নির্ধারিত হয়েছে কারণ, গবেষণার জন্য বাস্তবিকই এমন একটি ইউনিয়ন নির্বাচন করা প্রয়োজন, যা তৃণমূল পল্লীর চিরায়ত আবহ ধরে রেখেছে এবং একই সঙ্গে সনাতন ও আধুনিক মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও যা গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রতিনিধিত্বশীল রূপে চিহ্নিত। অন্যান্য ইউনিয়ন খুঁজে দেখা গিয়েছে সেগুলোতে গ্রামের সনাতন বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে' না গ্রাম না শহর' অবস্থায় রয়েছে। সে গুলো তৃণমূল সমীক্ষার উপযোগী কোন ইউনিয়নের বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন নয়। এই গবেষণা সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত ইউনিয়নটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত এবং ইতোপূর্বে ইউনিয়নটির ওপর কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। উলেখিত বিষয়াদি বিবেচনা করে গবেষণার বিষয়ের সমীক্ষার উপযোগী টাংগাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইল ইউনিয়নটি নির্বাচন করা হয়েছে।

১.১২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার বিভিন্ন সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। এ গবেষণা কর্মটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সামগ্রিক গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা গুলোর মোকাবেলা করতে হয়েছে তার প্রধান দিক গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

১। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামবাসীর সন্দেহ প্রবণতা। গবেষণা কর্মটিকে সরকারী কাজের অংশ মনে করে তারা প্রথম দিকে গোপনীয়তা ও

Dhaka University Institutional Repository

সতর্কতার সাথে উত্তর প্রদান করার চেষ্টা করেছে। এছাড়াও প্রায় সব উত্তরদাতাই যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে সে গুলো হলো, 'আপনি কেন এ কাজ করতে এসেছেন?' 'এতে আপনার কি লাভ?, 'এতে আমাদের কি লাভ?' 'আপনি কি সরকারী লোক?' ইত্যাদি।

২। গ্রামের অধিবাসীদের বয়স, পেশা, আয়ের সঠিক হিসাব ইত্যাদি পাওয়া কঠিন। কারণ, গ্রাম এলাকায় জন্মনিবন্ধীকরণের অভাবে বেশির ভাগ ব্যক্তিরই জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। গ্রামবাসীদের অনেকেই জন্মের বছর বাংলা সালের উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন তার জন্ম বন্যা বা খরার বছর। কারো কারো বা গণ্ডগোলের বছর এর আগে বা পরে। অনেকেরই বয়স অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার যারা একাধিক পেশায় নিয়োজিত তাদের পেশা নির্ধারণ কঠিন ব্যাপার।এক্ষেত্রে যে পেশায় অধিক সময় কাটান সেটিকে ব্যক্তির প্রধান পেশা হিসেবে ধরা হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ জনগণের আয় নিরূপণ করতে গিয়ে দেখা গেছে অধিকাংশ মানুষেরই আয়ের সঠিক হিসাব নেই। আবার অনেকের নিজস্ব কোন আয় নেই। সেখানে পারিবারিক আয়কেই ব্যক্তির আয় ধরা হয়েছে।

৩। রাজনীতির মতো একটি সংবেদনশীল বিষয়ে গ্রামীণ জনগণ তথ্য প্রদানে অনীহা প্রকাশ করেছেন।

৪। বর্তমান গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজটি করতে হয়েছে দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সময়ে। দেশ জুড়ে বোমা হামলা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আইন শৃংঙ্খলার অবনতি এ ধরনের পরিস্থিতিতে। যার কারণে উত্তরদাতাগণ রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য প্রদানে একদিকে যেমন ইতস্তত প্রকাশ করেছেন অন্যদিকে তেমনি বর্ষার পানি, কাঁদা ,প্রচন্ড গরম সব মিলে দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যার মধ্যদিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

৫। অনেক উত্তরদাতাকে প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলো বিভিন্নভাবে বোঝানো হয়েছে এবং তাদের উত্তরের মধ্যে বিভিন্ন অসংগতি লক্ষ্য করা গেছে। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয়বার একই প্রশ্ন বোঝানোর মাধ্যমে সঠিক উত্তর পাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

৬। গবেষণাকর্মটির কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং স্থান সংকুলানের অভাবে ব্যাপক সংখ্যক তথ্য, সারণী, বিশ্লেষন সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়টি সামান্য হলেও গবেষণা কর্মটিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview method) এবং সার্ভে পদ্ধতি (Survey method) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে কাঠামোগত প্রশ্নের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি না করেই উত্তরদাতাগণ অনেকসময় উত্তর প্রদান করেছেন। ।

উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ গবেষণা কর্মটি যথাসম্ভব সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে এবং গবেষণার লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। বিশেষ করে, গ্রাম পর্যায় থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় এটি একটি বড় সফলতা বলে মনে হয়। এ গবেষণা কর্মটি এ বিষয়ে পরবর্তী গবেষকদের তথ্যগত ও তত্ত্বগত ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

১.১৩ অধ্যায় বিন্যাস ঃ

বর্তমান গবেষণাটিকে আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে পৃথক পৃথক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবে তা বিষয়বস্তুর ও গবেষণার অনুমানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। সর্বত্রই নির্ধারিত অনুমানসমূহ পরীক্ষা করার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি মূলতঃ বর্তমান গবেষণাকর্মের একটি ভূমিকা। গবেষণার বিষয়বস্তু, গবেষণার উদ্দেশ্য, অনুমান গঠন, গবেষণার যৌক্তিকতা, চলক নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও কৌশল, তথ্যের উৎস, নমুনায়ন, বিশেষণের একক, গবেষণা এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা, গবেষণার সীমাবদ্ধতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্তমান গবেষণার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বই পত্রের পর্যালোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে সমীক্ষাধীন ইউনিয়নের পরিচিতি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সমীক্ষাধীন এলাকার উত্তরদাতাদের সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সুশাসন প্রত্যয়টির ধারণাগত ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ অংশে সুশাসন ধারণার উৎপত্তি, ধারণাগত বিভিন্নতা ,রাষ্ট্রের পুনঃ সংজ্ঞার্থ, বৈশিষ্ট্য, অপশাসন, সুশাসনের ক্ষেত্রসমূহ, সুশাসনের বৈশিষ্ট্য, বৈশ্বিক সুশাসন, জাতীয় সুশাসন, ই-সুশাসন ও স্থানীয় সুশাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ কেমন তা বিশ্লেষনে ঐতিহাসিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সর্বস্তরের জনগণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন কিনা, নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য তারা পালন করে কিনা এবং এই সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমর কোন ভূমিকা পালন করে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবস্থা এবং এই সব নেতাদের নির্বাচনে জনগন কোন বিষয় গুলো গুরুত্ব দেয়,নারী নেতৃত্বের প্রতি তাদের মনোভাব, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অংশ গ্রহণের স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়গুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতির সংস্কৃতি,ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের উপাদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

অষ্টম অধ্যায় মূলত ঃ বর্তমান গবেষণার উপসংহার। এখানে সমগ্র গবেষণা কর্মটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এবং গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে এবং অনুমান গুলো কিভাবে পরীক্ষিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুস্তক পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

সমাজবিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণের পর বিজ্ঞানভিত্তিক ও পদ্ধতিগতভাবে কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক বই-পত্রের পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ সকল বই -পত্র পর্যালোচনা থেকে নির্বাচিত গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এ সকল পর্যালোচনা সমীক্ষাধীন বিষয়ের তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং প্রায়োগিক ভিত্তির ক্ষেত্রে সহায়ক হয় এবং গবেষণার উদ্দেশ্য অর্জনে গতিমুখ সৃষ্টি করে। এছাড়া গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বই পুস্তক, জার্নাল, প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে অনেক ধারণা পাওয়া যায় যা গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তেমন কোন গবেষণাকর্ম পাওয়া যায়নি। তথাপি বিষয়টির সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত কতিপয় সাহিত্যকর্মের পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

Hasnat Abdul Hye(ed.), Governance – South Asian Perspectives, Dhaka, University Press Limited 2000

গ্রন্থটির মোট আটটি ভাগে সর্বমোট ত্রিশটি প্রবন্ধ রয়েছে। গ্রন্থের প্রথম ভাগে রয়েছে ধারণাগত কাঠামোর উপর দু'টি প্রবন্ধ। সম্পাদকের লেখা প্রথম প্রবন্ধটিতে সুশাসনকে নতুন শতাব্দীর জন্যে একটি সামাজিক চুক্তি হিসেবে দেখা হয়েছে। তিনি ধারণাগত কাঠামো হিসেবে রাষ্ট্রকে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং অনানুষ্ঠানিক কাঠামোগুলোর তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে আইন বিভাগ,বিচার বিভাগ, শাসন ও প্রশাসন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা, শাসন ও অর্থনীতি, সিভিল সমাজ, শাসন ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কমিউটিনটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম ভাগের দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সামর্থ্য, আন্তঃরাষ্ট্রিক জোট এবং বাজার অর্থনীতি ও সরকারের সামর্থ্যের বিষয়টি সংস্কার কর্মসূচির আলোকে দেখানো হয়েছে। প্রবন্ধকার বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর জাতি রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল ভূমিকা, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন, মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, রাষ্ট্র ও সিভিল সমাজ, উদারীকরণের চাপ, রাষ্ট্র ও উন্নয়ন কৌশল প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেছেন।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় ভাগে আইন বিভাগের উপর রয়েছে চারটি প্রবন্ধ । বাংলাদেশের আইন বিভাগ ও শাসনের উপর দিলারা চৌধুরী আইন বিভাগের বিবর্তন, সংসদীয় ব্যবস্থা, সুশাসনের আলোকে দেখিয়েছেন। পিটার লিয়ন তাঁর রচনায় সংসদীয় ব্যবস্থা ও সুশাসন গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন এবং বৈশ্বিক সুশাসন বিষয় সংক্ষিপ্ত ভাষা দিয়েছেন। নেপালের সংসদ ও শাসন নিয়ে লিখেছেন কৃষ্ণ কুনল । তিনি নেপালের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংসদের গঠন,স্থিতিশীলতার সমস্যা , আমলাতন্ত্র , বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় শাসন, বৈদেশিক সম্পর্ক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কে. এম. সোবহান, তার প্রবন্ধে শাসনে অংশগ্রহণের দিকটি আলোকপাত করেছেন।

গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বিচার বিভাগ নিয়ে চারটি প্রবন্ধের প্রথমটির লেখক রঙ্গনাথ মিশ্র ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। আমীর উর ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে মৌল নীতিমালা, প্রশানিক আইন, সকলের প্রতি ন্যায় বিচারে গুরুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেন। সালমা খান সুশাসন ও বিচার বিভাগের আলোচনায় নারীর সমানাধিকারের বিষয়ে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, শিশু ও নারীর অধিকারের বিশেষ বিধি, বিবিধ কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন। মিজানুর রহমান তার প্রবন্ধে বিচার বিভাগের স্বধীনতা , সাংবিধানিক বিধি, জবাবদিহিমূলক সরকার, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা নিয়ে আলোকপাত করেন।

গ্রন্থটির চতুর্থ ভাগে প্রশাসন বিষয়ে চারটি প্রবন্ধের প্রথমটিতে মিজানুর রহমান শেলী নয়া শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের আলোকে সুশাসন , সিভিল প্রশাসন, রাজনৈতিক আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবার্ট লাপোর্ট লোক প্রশাসন, সুশাসন, বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। সিরিল গুনাপালা শাসন এবং শ্রীলঙ্কার প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করেন। নরমা মনসুর উন্নয়ন প্রশাসন ও মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতা সবিস্তারে তুলে ধরেন ।

গ্রন্থটির পঞ্চম ভাগে স্থানীয় সরকার নিয়ে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। এ অংশের প্রথম প্রবন্ধে সাইদুর রহমান রাষ্ট্রের পূনর্নির্মিত ভূমিকা, দক্ষিণ এশিয়ায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা , বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নিয়ে আলোকপাত করেন। অন্ধ্র প্রদেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুশাসনের জন্যে স্থানীয় সরকার নিয়ে আলোচনা করেন রমেশ কুমার। নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ ও উন্নয়নশীল বিশ্বে নগর শাসন নিয়ে আলোচনা করেন। শুভ্র কৃষ্ণ তার প্রবন্ধে সুশাসনে নগর সরকারের ভূমিকা এবং তাসনিম আহমেদ সিদ্দিকী পাকিস্তানের শাসন নিয়ে আলোচনা করেন। দীনেশ মেহতা এশিয়ার প্রেক্ষিতে নগর শাসন নিয়ে আলোচনা করেন।
রেহমান সোবহান গ্রন্থটির ষষ্ঠ ভাগে উন্নয়ন এজন্ডায়, শাসনের ভূমিকায় দক্ষিণ এশিয়ায় দাতাদের ভূমিকা , অভ্যন্তরীণ রাজনীতি , শাসন ও উন্নয়নে রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন অর্থনীতি ও সুশাসন, জাঈদী সাত্তার ওয়াশিংটন ঐকমত্য ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সুশাসন, কবির হোসেন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শাসন এবং অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

গ্রন্থটির সপ্তম ভাগে সিভিল সমাজ ও শাসন বিষয়ে দু'টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির অষ্টম ভাগে শাসন এবং আন্ত র্জাতিক উন্নয়ন কমিউনিটি বিষয়ে আবুল মাল আব্দুল মুহিত, ইমতিয়াজ আহমদ,মেঘনা গুহ ঠাকুরতা, শাব্বির চীমা চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।
এ অংশের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মেঘনা গুহ ঠাকুরতা উপস্থাপনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি উন্নয়ননীতির পরিবর্তন , উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের শাসনের ক্ষেত্রসমূহের উপর বস্তুনিষ্ট আলোচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

V.A. Pai Panandiker(ed.), Problems of Governance South Asia,Dhaka,University Press Limited,2000.

দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশের শাসন সমস্যার ক্ষেত্রে বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে এই সংকলন গ্রন্থটির সমীক্ষায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সমীক্ষিত দক্ষিণ এশীয় পাঁচটি দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান, নেপাল ও শ্রীলংকা। এই পাঁচটি দেশ কতিপয় বিষয়ে শাসন ক্ষেত্রে একই সমস্যার মুখোমুখী হয়েছে। গ্রন্থটিতে সাধারণ সমস্যাগুলো এই আশায় আলোকপাত করা হয়েছে যে, অন্যান্য রাষ্ট্রে গৃহীত ব্যবস্থার সুবিধাদি উপলব্ধি করে দক্ষিণ এশিয়ার সুশাসনের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি নেয়া সম্ভব হয়।

গ্রন্থটিতে দক্ষিণ এশীয় শাসন সমস্যাকে আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে ।শাসনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সমস্যা সীমাহীন। যে সকল সমস্যা প্রধান এবং দক্ষিণ এশীয় জনগণের জীবনমানের সঙ্গে সম্পর্কিত তা গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচিত হয়েছে। সম্পাদক সমাপ্তি অধ্যায়ে পনেরটি মৌলিক সমস্যা চিহ্নিত করেন এবং দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে ন্যূনতম আটটি কর্মসূচি গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় অধ্যায় দক্ষিণ এশীয় জনতাত্ত্বিক সমস্যা , তৃতীয় অধ্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ার গণতন্ত্রের কার্যকারিতা, চতুর্থ অধ্যায়ে শাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ, পঞ্চম অধ্যায়ে দক্ষিণ এশীয় রাজনৈতিক দল ও শাসন , ষষ্ঠ অধ্যায়ে সামরিক বাহিনী ও শাসন, সপ্তম অধ্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় শাসন ও সন্ত্রাসের উত্থান, অষ্টম অধ্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় উপ-জাতীয়(Sub National)গোষ্ঠীর পরিচিতি ও শাসন সমস্যা , নবম অধ্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় -দক্ষিণ এশিয়ায় অপশাসন ও উন্নয়ন, দশম অধ্যায়ে দারিদ্র, প্রবৃদ্ধি ও শাসন, একাদশতম অধ্যায়ে শিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও শাসন, দ্বাদশ অধ্যায়ে নগরায়ন ও শাসনের সমস্যা এবং শেষ অধ্যায়ে শাসনের সমস্যা এবং দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে কর্মসূচী শিরোনমে আলোচ্য বিষয়কে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে, শাসন সমস্যার মূলে রয়েছে রাজনীতি। রাজনীতি ও সুশাসন কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বন্দ্ব অবস্থায় রয়েছে। রাজনীতির সামান্য ক্ষেত্রেই সামাজিক ন্যায় বিচার পরিলক্ষিত হয়। এ লক্ষ্যে কার্যকর অর্থনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা নেই। আরো বলা হয়েছে, রাজনীতিবিদদের এজেন্ডা সীমিত শুধু ক্ষমতার (Power) ক্ষেত্রে।

Kamal Siddiqui, Local Governance in Bangladesh- Leaed Issues and Major Challenges, Dhaka, University Pt. Ltd. 2000.

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ কামাল সিদ্দিকীর লিখিত গ্রন্থটির উপজীব্য হলো, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় প্রশাসন, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার কাঠামো এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সিভিল সংগঠন।

গ্রন্থটির পাঁচটি অধ্যায়ে সর্বমোট সাতাশটি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রথম অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের শাসনের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা রয়েছে। এ অংশে লেখক বিশ্ব ব্যাংক ও ইউএনডিপি শাসন বলতে যা বুঝিয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। তিনি শাসন ও সুশাসনের পাশাপাশি দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা,বিকেন্দ্রিকরণ, অংশগ্রহণ, উন্নয়ন,তৃণমূল গণতন্ত্র, স্থানীয় সম্পদ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রথম অধ্যায়টি প্রকৃতই গ্রন্থটির একটি সূচনা অংশ । দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে স্থানীয় সরকার সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে নয়টি প্রবন্ধ। ক্ষুদ্র কলেবরের প্রবন্ধগুলোতে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের স্থানীয় সরকার, স্থানীয় নির্বাচিত কাঠামো এবং এদের আমলাতান্ত্রিক অংশীদারদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন, কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এনজিও কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, ব্যক্তি খাত, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা, উপজেলা পরিষদ, মেট্রোপলিটন সরকার , সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে সংস্কার, স্থানীয় সরকারের অর্থায়ন, স্থানীয় সরকারের প্রশিক্ষণ, একটি স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ্রন্থটির তৃতীয় অধ্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন সংস্কার , প্রশাসনিক স্তর হিসেবে বিভাগের প্রয়োজনীয়তা, ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের ভূমিকা, গ্রাম্য আদালত, গ্রামীণ সালিশ , খাস জমি বিতরণ , প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ , শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাতীয়করণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটির চতুর্থ অধ্যায়ে সিভিল সমাজের সংস্কার অংশে বাংলাদেশে এনজিওদের ভবিষ্যত ভূমিকা , লক্ষ্যদল ঋণের ব্যবস্থাপনার সমস্যাও সম্ভাবনা, গণতন্ত্র শিক্ষা কর্মসূচি, ঢাকা শহরে থানা ও জেলা সমিতিসমূহ, বাংলাদেশ সমবায়, স্থানীয় হাট বাজার ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশে স্থানীয় শাসন ও মাধ্যম, অনানুষ্ঠানিক শাসনে তৃণমুল পর্যায়ে ন্যায় বিচার , গ্রাম উন্নয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে শাসন ব্যবস্থাপনা লেখক বিশ্লেষণ করেন।

পঞ্চম ও শেষ অধ্যায়ে শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে জনগণের বিভিন্ন শক্তিশালী গোষ্ঠীর মনোভাব ও অবস্থান রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে লেখক উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সমাজের মতো একটি পুরুষ আধিপত্যশীল

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থায় এলিট এবং শাসন সংস্কারের বৈদেশিক অর্থের স্বার্থের দিকটি তুলে ধরেছেন। লেখক স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোয় নারীদের অন্তর্ভুক্তিকে বিভিন্ন সম্পদমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে দেখান।

গ্রন্থটির একটি দুর্বল দিক হচ্ছে, স্থানীয় উন্নয়নকে বহুমাত্রিক দিক থেকে দেখা শাসন, শাসন সংস্কার , সিভিল সমাজ এবং প্রশাসন বিষয়ক লেখায় গুরুত্বপূর্ণভাবে উপস্থাপনা করা হয়নি।

Almond,G.A. and Sidney Verba, The Civic Culture : Political Attitudes and Democarcy in Five Nations, Princeton, New Jersey, 1963.

গ্রন্থটিতে ৫টি অংশ রয়েছে। এখানে মূলত রাজনৈতিক সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ , সামাজিকীকরণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আলোচনাকালে ৫টি দেশকে কেস স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দেশগুলো হলো আমেরিকা, বৃটেন, মেক্সিকো, জার্মানী ও ইতালী । রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হল ঃ(১) সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial Political Culture) ; (২) প্রজাসুলভ রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subject Political Culture) ; (৩) অংশগ্রাহক রাজনৈতিক সংস্কৃতি(Participant Political Culture)।

এছাড়াও তিন ধরণের মিশ্র সংস্কৃতি ও উপসংস্কৃতির কথা বলেছেন। এগুলো হল ঃ (১) Parochial - Subject;(২) Subject- Participant; (৩) Participant Parochial। তাদের আকর্ষণ ছিল মূলত পৌর(Civic) সংস্কৃতির উপর। এই পৌর সংস্কৃতি বলতে তারা এমন সংস্কৃতিকে বুঝিয়েছেন যেখানে গণতন্ত্রকে কার্যকর করার কতিপয় উপাদান রয়েছে। গ্রন্থটিতে তারা দেখিয়েছেন অনুন্নত দেশগুলোতে কেন গণতন্ত্র ব্যর্থ হয় এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। আর তার জন্য তারা গতানুগতিক সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির উল্লেখ করেন। তাদের মতে, পৌর সংস্কৃতির সাথে গণতন্ত্রের ইতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান।

Alexander , J.C. and S. Seidman. Culture and Society, Cambridge University Press, Cambridge,1994.

গ্রন্থটিতে মূলত সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব (approaches to culture) আলোচনা করা হয়েছে। যেমন- সিমেইটিক, ড্রামাটুর্জিকাল, ওয়েবারিয়ান, ডুরখেইমীয়, মার্কসীয়, পোষ্ট স্ট্রাকাচারালিষ্ট ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে দুটি মূল অংশের প্রথম অংশে এই পদ্ধতিগুলো এবং মানুষের সংস্কৃতি কি ধরনের তা

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মূল্যবোধ , আদর্শ প্রভৃতিকে বিবেচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে ব্যক্তির সংস্কৃতির সাথে ধর্মকে সংশিষ্ট করা হয়েছে। আবার আদর্শহীনতা কোনো সাংস্কৃতিক অর্ডার (order) সৃষ্টি করতে পারে কিনা সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় নি।

• Pye, Lucian and Sidney Verba, Political culture and Political Development. Princetion. New Jersey. New York, 1965.

গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে লুসিয়ান পাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারনা দেওয়ার পাশাপাশি দেখিছেন যে,প্রত্যেক প্রজন্ম হয় তাদের পূর্ব পুরুষদের রাজনেতিক মতামতকে গ্রহন করে নয়তো তার প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। লেখকদ্বয় রাজনেতিক সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কও দেখিয়েছেন । ১০টি দেশকে অধ্যয়ন করে মানুষের জীবনাচরণের বিভিন্নতা তারা খুঁজে পেয়েছেন । আবার এতসব বিভিন্নতা সত্তেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে কতিপয় রূপ বিদ্যমান তা তুলে ধরেছেন । এছাড়া ব্যাক্তির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিভাবে কাজ করে তাও স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন।

La Palombara, Joseph, Politics Within Nations, Prentice-Hall, 1974 .

গ্রন্থটিতে বিভিন্ন সমাজের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারকারী চলক গুলোর সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে । এখানে দেখানো হয়েছে যে, ধর্ম হচ্ছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের শ্রেষ্ঠ চলক । তাঁর মতে , মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিন ব্যতিত যে কোনো স্থানের একজন শ্বেতাঙ্গ অ্যাংলো মেক্সন প্রোটেস্ট্যান্ট যে কোন সফল আইনজীবি বা শিল্পপতি যেই হোক না কেন, তিনি রিপাবলিকান দলকে ভোট দিবেন। অনুরুপভাবে একজন ক্যথলিক, তিনি Italo American brick layer বা Irish American পুলিশ হতে পারেন, তিনি ডেমোক্রেটিক দলকে ভোট দিবেন । তিনি বলেন, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে এরূপ প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত ব্যাক্তিদের কেউই ধর্মীয় বিশ্বাসের বাহিরে যাবেন না। তাঁর মতে, ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর বিজয়ের পিছনে অন্যান্য কারনের চেয়ে ধর্মীয় উপাদান বেশি কাজ করেছে।

Dahl, R. A. Modern Political Analysis , Prentice-Hall, Inc.,1963.

গ্রন্থটিতে ব্যক্তি-নাগরিকের মনস্তাত্তিক দিক এবং রাজনৈতিক আচরনের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । লেখকের মতে , সব সমাজে রাজনৈতিক অংশগ্রহনকারীরা অ-রাজনৈতিক, রাজনৈতিক ,ক্ষমতান্বেষী এবং ক্ষমতাবান

Dhaka University Institutional Repository

এই চার স্তরের হয়ে থাকেন। তার মতে , একজন ব্যক্তির রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বাড়বে যদি ঐ ব্যক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করেনঃ

১.রাজনীতিতে জড়িত হলে যে পুরষ্কার পাওয়া যাবে সেটিকে যদি সে মূল্যবান মনে করেন; ২. বিকল্পগুলিকে মল্যবান ভাবেন; ৩. ফলাফল বদলে দিতে পারে এমনভাবে আত্মবিশ্বাসী হয় ; ৪. কাজ না করলে ফলাফল সন্তোষজনক হবে এমন বিশ্বাস করেন; ৫. বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হন; ৬. কাজ করার পর কিছু বার্তা উত্তরণ আবশ্যিকভাবে করতে পারবেন। Dahi বলেন, এ বিষয়গুলো এবং আরও কিছু কারণে কিছু লোক রাজনীতিতে আগ্রহী হয় , কিছু লোক রাজনীতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ও জ্ঞাত থাকে। কিছু লোক রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করে । এসব অংশগ্রহণকারীদের সকলেই রাজনৈতিক স্তরের অন্তর্ভূক্ত এবং সাধারণত ভোট প্রদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

Milbrath,Lester W.and M.H.Goel, Political Participation: How and Why People Get Envolved in Politics, University Press of America, New york ,1977

গ্রন্থটিতে লেখক রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কতকগুলি " mode " উলেখ করেছেন যার মাধ্যমে ভোটদান (votting)অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ mode । লেখকদ্বয় এশিয়া , আফ্রিকাসহ বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রকৃতি বিশেষণের চেষ্টা করেছেন। এছাড়াও ভোটারদের রাজনৈতিক বিশ্বাস যে ভোট আচরণের উপর প্রভাব ফেলে তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তারা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর একটি 'Hierarchy Model প্রদান করেছেন যার কিছু চলক আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে।

Verba, Sidney, Norman H. Nie and Jae-on- Kim, Participation and Political Equaility : A Seven Nation Comparison. Cambridge Press, Cambridge, 1978.

গ্রন্থটিতে সাতটি জাতির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রিয়া, ভারত ,নাইজেরিয়া,নেদারল্যান্ড,যুগোশাভিয়া, জাপান) ভোটারদের রাজনৈতিক আচরন তথা ভোট আচরন,প্রচার কর্মকান্ড, কমিউনিটি কর্মকান্ড ও ব্যক্তিগত অংশগ্রহন ইত্যাদির উপর তাত্ত্বিক ও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের মতে, অভিজ্ঞতা ,আয় . শিক্ষা, লিঙ্গ , আঞ্চলিকতা ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

চলকগুলো রাজনৈতিক অংশ গ্রহনের উপর খুবই ক্রিয়াশীল । এ প্রেক্ষিতে তারা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপর একটি Comprehensive Participation and Equality Model প্রদান করেছেন।

ModelHeld,david,Models of Democracy,Policy Press,1987.

গ্রন্থটিতে গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থটিতে লেখক প্রচীনকাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিকশিত তত্ত্ব সমুহ পর্যালোচনা করেছেন । তবে এখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি।

Wolfinger,Raymond E. and Steven J. Rosenstone,Who Votes?, Yale University Press ,New Heaven and London, 1983.

গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ডেমোগ্রাফিক চলকের মাধ্যমে রাজনৈতিক অংশগ্রহন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের আর্থ - সামাজিক চলকের সাহায্যে তাদের ভোট আচরনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখকদ্বয় বলেন, ভোটদানের ক্ষেত্রে শিক্ষা তথা রাজনৈতিক চেতনাই আর্থ - সামাজিক মর্যাদার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । গবেষকদ্বয় যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের রাজনৈতিক কর্মকান্ড , কমিউনিটি কর্মকান্ডে জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের হার কি পর্যায়ে রয়েছে এবং কোন শ্রেণীর জনগণ বেশি ভোটদান করেন তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

Almond and Powell , Comparative Politics Today : A World View Little Brown Company, New York, 1980.

গ্রন্থটিতে লেখকদ্বয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তির মনোভাব, বিশ্বাস এবং অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেননা ব্যক্তির রাজনৈতিক সচেতনতা উল্লেখিত বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

Afsaruddin , M . Society and Culture in Bangladesh, Book House, Dhaka , 1990.

গ্রন্থটিতে ৯টি অধ্যায় রয়েছে। এখানে বাংলার ঐতিহাসিক দিক , জনগণের জীবনযাত্রা, সামাজিক পারিবারিক সম্পর্ক, ধর্মীয় আচার প্রথা , রাজনীতি , তাদের বিশ্বাস ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে দেখানো হয়েছে যে ,বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামো রক্ষণশীল, ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা শক্তিশালী নয় । লেখকের মতে, এমনকি বিয়ের ব্যাপারেও ব্যক্তির পরিবর্তে তার অভিভাবকের মতামতের প্রাধান্য দেখা যায়। মহিলাদের পর্দা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথাকেও তিনি স্বাধীনতার পক্ষে বাধা হিসেবে দেখিয়েছেন। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে যে হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্র প্রভাব রয়েছে সে বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, হিন্দু সংস্কৃতিতে পূনর্জন্মে বিশ্বাসের কারণে এদেশের রাজনীতিতে তাদের নিষ্ক্রিতা দেখা যায়। গ্রামীণ জনগণের মধ্যে অনেক কুসংস্কার রয়েছে। যেমন- কোন দিন যদি করো ভালভাবে অতিবাহিত না হয় তবে মনে করে যে পূর্বে কোন পাপের শাস্তি বিধাতা দিচ্ছে। তিনি আরও দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশের মানুষ রাজনৈতিক পছন্দের ক্ষেত্রেও পরিবার দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়। গ্রাম বাংলার গান-বাজনার মধ্যেও আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পরিস্ফুটিত হতে দেখা যায়।

Bhuyan,M. Sayefullah, "Political Culture in Bangladesh" in Social Science Review,Dhaka University Studies, 1991.

প্রবন্ধটিতে প্রধানত ৩টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রথমত রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক সংস্কৃতি কিভাবে রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করে সে সম্পর্কে এবং তৃতীয়ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন । প্রথম অংশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন জনের মতামত তুলে ধরার সাথে সাথে প্রবন্ধকার মত প্রকাশ করেন যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল রাজনৈতিক বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ,দ্বিতীয় অংশে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কাঠামোর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। তার মতে, কোন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামো কেমন হবে, তাতে স্থিতিশীলতা থাকবে কিনা ইত্যাদি অনেকটাই নির্ভর করে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। তৃতীয় অংশে লেখক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই উপাদানগুলোর প্রকৃতি বাংলাদেশে কেমন তা ব্যাখ্যা করেছেন। আর তিনি বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নিম্ন প্রকৃতির (Parochail) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

Khan,Shamsul I., Islam S.Aminul and Haque M.Imdadul, Political Culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1996.

গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির তাত্ত্বিক বিকাশ, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তাদের মতে,"রাজনৈতিক সংস্কৃতি" শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় লেনিন কর্তৃক । পরে ১৯৩০ এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ Sindey ও Beatrice Webb ব্যবহার করে। এরপর তাত্ত্বিক বিকাশ আজ পর্যন্ত দেখিয়েছেন। তাদের আলোচনার মধ্যে আরও একটি বিশেষ বিষয় স্থান পেয়েছে। যেমন, তারা বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূলে ঐতিহাসিকভাবে কি কি বিষয় কাজর করেছে সেই সব ধর্মীয়,সামাজিক বিষয় তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

Hussain, Naseem A and Khan M. Salimullah , " Culture and Politics in Bangladesh : Some Reflections" in Bayes , Bangladesh at 25 : An Analytical Discourse on Development , Dhaka, 1998.

প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকার সমাজে বাঙ্গালীর আচরণ,অভ্যাস,বিশ্বাস,কার্যাবলী,মূল্যবোধ প্রভৃতির ভিত্তিতে সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এ দেশের রাজনীতির সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে তারা বলেন যে , বাঙ্গালী সমাজের পারিবারিক কাঠামো কর্তৃত্ববাদী বিধায় তাদের রাজনৈতিক চিন্তাও গণতান্ত্রিক নয়। কারণ যারা গণতান্ত্রিক সমাজ, পরিবার বা রাজনৈতিক অঙ্গনে বসবাস করে না তাদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না । তারা পাশ্চাত্যের সাথে আমাদের দেশের পরিবেশ ও সমাজিকীকরণের পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাদের মতে, এ কারণে আচরণগত পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয় । তারা রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির যোগসূত্র স্থাপন করেছেন এবং বলেছেন যে , মানুষ যে ধরণের বিশ্বাস করে রাজনীতিতেও তেমন আচরণ করে।বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও বিষয়টি তারা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তথ্যের ভিত্তিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

Jahangir, B.K., Rural Society , Power Structure and Class Practice, Centre for Social Studies, Dhaka, 1982.

এ গ্রন্থে লেখক মোট নয়টি অধ্যায়ে গ্রামীণ সমাজ সম্পর্কে সার্বিক আলোচনা করেছেন। প্রথমেই তিনি সামাজিক সংগঠন যেমন - বংশ , গোত্র , সম্প্রদায়, স্থানীয় প্রশাসন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার গ্রন্থে সামাজিক সম্পর্ক, ক্ষমতা ব্যবস্থ ,শ্রেণী , ভূমির মালিকানার সাথে ক্ষমতা কাঠামো ,সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তিনি সম্পদ, আয় , সুনাম, পেশা, শিক্ষা, বিভিন্ন ধরণের যোগাযোগ এবং বিভিন্ন রকম সমাজিক বিষয়াদিতে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষমতার নির্ধারক হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি "তদবীর " ও " তকদির" শব্দ দু'টির ব্যবহার করে দেখিয়েছেন যে, গ্রামের অসহায় , দরিদ্র , শোষিত জনগোষ্ঠী'তদবিরে' (ভাগ্য) বিশ্বাস করে। তাদের এই অবস্থার জন্য তারা তাদের ভাগ্যকেই দায়ী করেন ।

Siddique, Kamal (ed), Local Government in Bangladesh, NILG, Dhaka,1984.

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশ , কাঠামো এবং গঠন প্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সরকারের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সম্পর্ক এবং স্থানীয় সরকারের কতিপয় বিতর্কিত সমস্যাবলী , যেমন - সাহায্য , মঞ্জুরী , ক্ষমতা কাঠামো, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Hasanuzzaman, Al Masud, Role of Opposition in Bangladesh Politics,UPL,১৯৯৮ .আল মাসুদ হাসানউজ্জামান তাঁর গ্রন্থে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা কি হওয়া উচিত এবং বাংলাদেশে বিরোধী দল তাদের ভূমিকা কতটুকু পালন করেছে তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ১৯৭২-১৯৯০ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনে বিরোধী দলের ফলাফলগুলো এ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দল ও মতের প্রতি সহনশীলতা যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় সে বিশ্লেষণটিও এখানে স্থান পেয়েছে।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সামাজিকীকরণঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, ঢাকা নিবেদক প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন,১৯৮৯।

সামাজিকীকরণের বিভিন্ন মাধ্যম থাকলেও পাশ্চাত্যে যা সামাজিকীকরন ঘটায় বাংলাদেশে তা অনেক সময়ই কার্যকরী হয় না । আবার এখানে বিশেষ কিছু কিছু মাধ্যম আছে যা পাশ্চাত্যে কার্যকরী নয় । লেখক এ গ্রন্থে মূলত বাংলাদেশে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। গ্রামাঞ্চলে সাধারণত নির্বাচন আসলে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কিছুটা সাড়া পড়ে। অন্য সব সময় রাজনীতি তাদের জীবনকে তেমন স্পর্শ করে না। এই নির্বাচনকালীন রাজনীতি নিয়ে গ্রন্থটিতে আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে কিশোরদের মনন কিভাবে গঠিত হয়।স্থানীয় প্রশাসন গ্রামীণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির কি সম্পর্ক রয়েছে তাও আলোচিত হয়েছে গ্রন্থটিতে।

মান্নান, মোঃ আব্দুল ও মোঃ শফিকুল ইসলাম, " বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা ঃ দুটি গ্রাম অধ্যয়ন ", রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিত পত্রিকা,১৯৮৮।

প্রবন্ধটিতে লেখকদ্বয় সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার দুটি গ্রামে সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনার একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন । লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণেরই গণতন্ত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই। গ্রামীণ সমাজে মুষ্টিমেয় জনগণের মধ্যেই কেবল সঠিক গণতান্ত্রিক চেতনা লক্ষ্য করা যায়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কেও গ্রামীণ জনগণ তেমন অবগত নয় বলে লেখকদ্বয় তাদের প্রবন্ধে দেখিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মান্নান,অধ্যাপক মোঃ আব্দুল,বাংলাদেশে গণতন্ত্র সমস্যা ও সম্ভাবনা,আফসার ব্রাদার্স,ঢাকা,২০০২।

গ্রন্থটিতে ২৩টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়েই গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। লেখক গ্রন্থটির তিনটি অধ্যায়ে রাজনৈতিক সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন।বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিষয়টি গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে।

মান্নান , মোঃ আব্দুল (সম্পাদিত), কুটুরিয়া একটি গ্রাম,সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,সাভার, ঢাকা , জুলাই,১৯৯৯।

গবেষণা গ্রন্থে গ্রাম অধ্যায়ে সাক্ষাতকার গ্রহণ , বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি, গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা,প্রার্থী নির্বাচনের ভিত্তি,গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ,দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে জনগণের মনোভাব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

গবেষকগণ বলেন, গ্রামীণ সাধারণ মানুষ দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে তেমন কোন খোঁজ - খবর রাখেন না এবং তারা তাদের ভোটাধিকার বিভিন্ন কারণে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারছে না।

নাসরিন গফুরা, গ্রামীণ মহিলাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ঃ পানধোয়া গ্রামের একটি কেস স্টাডি , এম. এস. এস. থিসিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ , জা.বি.,সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।

গফুরা নাসরিন তার গবেষণাকর্মে দেখিয়েছেন, বয়স , শিক্ষা ,পেশা এবং আয়ের সাথে মহিলাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও রাজনৈতিক সচেতনতার সম্পর্ক রয়েছে। চলকগুলোর সাথে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, নিজ পছন্দে ভোট প্রদান , রাজনীতিতে নিজেকে সম্পৃক্তকরণ এবং বর্তমানে দেশে মহিলাদের অবস্থা উপলব্ধির কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে।

শিল্পী, সাগরিকা , বাংলাদেশে গ্রামীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরণ ঃ একটি কেস স্টাডি , এম.এস. এস. থিসিস সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, আগষ্ট,২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সাগরিকা তার গবেষণাকর্মে বাংলাদেশে গ্রামীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরন বিশ্লেষণের পাশাপাশি রাজনৈতিক সংস্কৃতি গঠণের ক্ষেত্রে কি কি উপাদান প্রভাবক হিসেবে কাজ করে সে বিষয়টিও বিশ্লেণের চেষ্টা করেছেন। তিনি গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নিম্ন মধ্যম প্রকৃতির এবং নিয়তিবাদী সংস্কৃতি বলে অভিহিত করেছেন।

রায়হান, অদুদ, ভোটাধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা ঃ হাজীপুর গ্রামের একটি কেস স্টাডি, এম.এস.এস. থিসিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় , আগষ্ট,২০০০ ।

অদুদ রায়হান তার গবেষণাকর্মে ভোটাধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের সচেতনতার বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এবং সে সাথে সচেতনতার ক্ষেত্রে কি কি প্রভাবক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়টিও অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি ভোটাধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা মধ্যম প্রকৃতির বলে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩য় অধ্যায়

গবেষণা এলাকার পরিচিতি

৩.১ অবস্থান

৩.২ আয়তন ও জনসংখ্যা

৩.৩ যাতায়াত ব্যবস্থা

৩.৪ হাট-বাজার

৩.৫ শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

৩.৬ রাজনৈতিক অবস্থা

৩.৭ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

৩.৮ উত্তরদাতাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি ঃ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণার জন্য ঝাওয়াইল ইউনিয়নকে বেছে নেয়া হয়েছে। এ অধ্যায়ে গবেষণাধীণ ইউনিয়নের পরিচিতি এবং গবেষণায় নমুনা হিসেবে গৃহীত উত্তরদাতাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণাধীণ ইউনিয়নের পরিচিতি

৩.১ অবস্থান ঃ

গবেষণাধীণ ইউনিয়নটি ঢাকা বিভাগের টাংগাইল জেলার গোপালপুর উপজেলায় অবস্থিত। ইউনিয়নটি ১৯৩৮ সালে স্থাপিত হয়েছে। এর পূর্বে নগদাশিমলা ইউনিয়ন, উত্তরে মুশুদ্দি ইউনিয়ন, দক্ষিণে হেমনগর ইউনিয়ন এবং পশ্চিমে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলা অবস্থিত। ইউনিয়নটিতে মোট ১৮টি গ্রাম রয়েছে। অসংখ্যা খাল--বিলসহ এর মাঝখান দিয়ে ঝিনাই নদী প্রবাহিত হয়েছে।

৩.২ আয়তন ও জনসংখ্যা ঃ

ঝাওয়াইল ইউনিয়নের আয়তন ১২.৩৭ বর্গ কিলোমিটার এবং এর জনসংখ্যা পুরুষ ১৬,৮৭৫ জন, মহিলা ১৬,৫৫৫ জন মোট ৩৩,৪৩০ জন (১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী)। ইউনিয়নটিতে ১৮টি গ্রাম ও ১৬টি মৌজা রয়েছে।

৩.৩ যাতায়াত ব্যবস্থা ঃ

ঝাওয়াইল ইউনিয়নের রাস্তা ও সড়কের পরিমাণ যথাক্রমে পাকা ১৬ কি.মি. এবং কাঁচা ৩৫ কি. মি.। ইউনিয়নের সাথে উপজেলা সদরের যোগাযোগ পাকা সড়ক পথে হয়ে থাকে। ইউনিয়নের মূল সড়ক পাকা হলেও গ্রাম গুলোর অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা। গ্রামগুলো থেকে রিক্সা বা ভ্যান গাড়ীতে বা ইঞ্জিন চালিত যানে ইউনিয়ন পরিষদে এবং উপজেলা ও জেলা সদরে যাওয়া যায়। বর্তমানে ঝিনাই নদীর ওপর ব্রীজ হয়ে যাওয়ায় যাতায়াতের জন্য নৌকা বা অন্যান্য নৌযান ব্যবহার না করলেও চলে।

৩.৪ হাট-বাজার ঃ

ঝাওয়াইল ইউনিয়নে মোট ৬টি হাট রয়েছে। সপ্তাহে ১দিন করে হাট বসলেও প্রতিদিনই বাজার বসে। বর্তমানে রাস্তাঘাটের উন্নতির কারণে বাজার গুলোতেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। বাজারে সাধারণত ঃ নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ছাড়াও সার, ঔষধসহ কৃষি উপকরণ, ধান, মরিচ, হলুদ ও মশলা, ধান ও চাল ভাঙানোর মেশিন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৫ শিক্ষা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ

ঝাওয়াইল ইউনিয়নে ১টি কলেজ, ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা, ৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৮টি রেজিষ্ট্রেশন কৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এখানে ১০ টি ঈদগাহ্,২৬ টি মসজিদ ও ৩ টি ডাকঘর রয়েছে। তাছাড়াও ১ টি ভূমি অফিস, ৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১টি ক্লাব ও ১২ টি সঞ্চয়ী সমিতি রয়েছে।

৩.৬ রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

গত দুটি (সপ্তম ও অষ্টম) নির্বাচনের ফলাফলল থেকে দেখা যায় এই ইউনিয়নে আওয়ামীলীগ ও বি এন পির প্রায় সমান সংখ্যক সমর্থক রয়েছে।

গত দুই নির্বাচনের ফলাফল ঃ এই আসন টি গোপালপুর ও ভুয়াপুর থানা নিলে। ১৯৯৬ সালের ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনটি লাভ করে আওয়ামীলীগের খন্দকার আসাদুজ্জামান এবং ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি এন পির এ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু।

ঝাওয়াইল ইউনিয়নে উলেখযোগ্য সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা পাওয়া না গেলেও বেশ কিছু সক্রিয় কর্মী পাওয়া গেছে। জাতীয় ও স্থানীয় রাজনীতির খবর গ্রামের উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিরাই বেশী রাখেন। এখানকার গ্রাম গুলোর বেশিরভাগ মানুষই রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের চেয়ে ভোটদানকে একমাত্র নাগরিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ ও বিএনপি'র সমর্থক এখানে বেশী। জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলে স্বল্প সংখ্যক সমর্থকও রয়েছেন।

৩.৭ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ঃ

ইউনিয়নটির অধিকাংশ গৃহস্থই কৃষির উপর নির্ভরশীল। ক্ষুদ্র একটি অংশ কোন চাষবাস করে না। এ অংশটি শহরে চাকুরী করে। তাদের জমি বর্গাচাষীরা চাষ করে থাকে। গ্রামগুলোর অর্থনীতিতে সুদের ব্যবসার প্রভাব ব্যাপক। ধনী গৃহস্থালী ধনী এবং গরীব গৃহস্থালীর সঙ্গে শুধু গরীব গৃহস্থালীর সুদের লেনদেন করে থাকে। অনেকে আবার বিভিন্ন এনজিও থেকে সুদের বিনিময়ে ঋণ নিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে কৃষক চাষবাসকে লাভজনক মনে করে না। কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, সেচ খরচ, কৃষি মজুরদের খরচ বৃদ্ধি সহ আরও অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে কৃষি উৎপাদনের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ কমে গেছে। অধিকাংশ কৃষকই বাৎসরিক খোরাকীর জন্য নিজ মালিকানা জমির একটি অংশে চাষ করে। অনেক কৃষক জানিয়েছে যে, ফসলের দামের চেয়ে ফসল উৎপাদনের খরচ অনেক বেশী পড়ে। কৃষকদের একটা অংশ, তাদের উৎপাদিত ফসলের কিছু অংশ নিত্য প্রয়োজনীয় বাজার খরচের অর্থ যোগাতে বিক্রি করে দেয়।

আগে বসতবাড়ীর আশে পাশের উঁচু জমিতে কৃষকরা রবিশস্য ফলাতো। বর্তমানে বিভিন্ন শস্য বাজার থেকে কিনে আনতে হয়। ইউনিয়নটির কয়েকটি গ্রামে কুমার, কামার, জেলে, গোয়ালা, এবং তেল ভাঙ্গানো পেশায় নিয়োজিত। এখানকার সব গ্রামে বিদ্যুত পৌঁছায়নি। ফলে এসব পেশায় বিদ্যুতের ব্যবহার নেই। গ্রামে বসবাসকারী একটি বড় অংশ বয়সে কম এবং তারা কোন উৎপাদনশীল কাজ করে না। তারা বাবা, মা সহ পরিবারের বড়দের উপর নির্ভরশীল। ইউনিয়নটিতে মুসলমান ধর্মের লোক বেশী হলেও অল্প কিছু হিন্দু ধর্মীয় লোকও রয়েছে।

ইউনিয়নের গ্রাম গুলোতে গোষ্ঠী এবং পাড়া কেন্দ্রীক গ্রামীণ নেতৃত্ব লক্ষ্যণীয়। প্রায় প্রতি পাড়াতেই 'মাতব্বর' আছেন। গ্রামের অভ্যন্তরীণ বিরোধ গ্রামের অধিবাসীদের উপস্থিতিতে মীমাংসা করা হয়। গ্রামের কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে কাউকে দাওয়াত না করলেও মাতব্বরকে দাওয়াত করা হয়। গ্রামগুলোতে উচ্চ বিত্ত ও মধ্যবিত্তদের প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই টিউবয়েল আছে। নিম্নবিত্তরাও এগুলো ব্যবহার করে থাকে। উচ্চ বিত্তদের প্রায় সবার বাড়ীতেই স্যানিটারী পায়খানা রয়েছে। কতিপয় বাড়ীতে আধাপাকা এবং বাকী সব গুলোই কাঁচা পায়খানা। এ ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রামেরই ২/১টি পাকা দালান ছাড়া বেশীর ভাগই টিনের তৈরী বাড়ী। বেশকিছু ছনের ঘরও আছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৮ উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি ঃ

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ও সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ঝাওয়াইল ইউনিয়নটিকে গবেষণার জন্য বেছে নেয়া হয়েছে। এই ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের সমীক্ষাহত নমুনার ভিত্তিতে গ্রামীণ মানুষের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

ক. বয়স

সারণী-৩.১ ঃ উত্তরদাতাদের বয়সের স্তর বিন্যাস

বয়সের স্তর	পুরুষ		ইারী		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
১৮ - ২৫	১৫০	২৫	৩০	২৫	১৮০	২৫
২৬ - ৩৫	২৪০	৪০	৪০	৩৩.৩৩	২৮০	৩৮.৮৯
৩৬ - ৪৫	১১০	১৮.৩৩	৩০	২৫	১৪০	১৯.৪৪
৪৬ - ৫৫	৬০	১০	১০	৮.৩৩	৭০	৯.৭২
৫৬ - ৬৫	৪০	৬.৬৭	১০	৮.৩৩	৫০	৩.৯৪
মোট	৬০০	১০০	১২০	১০০	৭২০	১০০

সারণী ৩.১ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২৬ - ৩৫ বয়স স্তরে পুরষ উত্তরদাতাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ২৪০ জন, যা মোট পুরুষ উত্তরদাতার ৪০ শতাংশ। নারী উত্তরদাতাদের ২৬ -৩৫ বয়স স্তরে সর্বোচ্চ ৪০ জন রয়েছে, যা মোট নারী উত্তরদাতার ৩৩.৩৩ শতাংশ। পুরুষ উত্তর দাতাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা ৪০ জনের বয়স স্তর ৫৬ - ৬৫ এবং তারা মোট পুরুষ উত্তর দাতার ৬.৬৭ শতাংশ। নারী উত্তরদাতাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা ৪৬ - ৫৫ এবং ৫৬ - ৬৫ বয়স স্তরে সর্বনিম্ন ১০ জন করে রয়েছে যা যথাক্রমে মোট নারী উত্তরদাতার ৮.৩৩ ও ৮.৩৩ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. শিক্ষা

সারণী ৩.২ ঃ উত্তরদাতাদের শিক্ষার স্তর বিন্যাস

শিক্ষার স্তর	পুরুষ		হারী		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
নিরক্ষর	৮০	১৩.৩৩	২০	১৬.৬৭	১০০	১৩.৮৯
৫ম শ্রেণী	১৬০	২৬.৬৬	৫০	৪১.৬৭	২১০	২৯.১৭
৮ম শ্রেণী	১৪০	২৩.৩৩	২০	১৬.৬৭	১৬০	২১.২২
এস.এস.সি	১১৪	১৯.০০	১০	৮.৩৩	১২৪	১৭.২২
এইচ.এস.সি	৮৬	১৪.৩৩	১৪	১১.৬৭	১০০	১৩.৮৯
স্নাতক বা স্নাতকোত্তর	২০	৩.৩৩	৬	৫.০০	২৬	৩.৬১
মোট	৬০০	১০০	১২০	১০০	৭২০	১০০

সারণী ৩.২ এ দেখা যায় যে, পুরুষ উত্তর দাতাদের ৮০ জন নিরক্ষর, যা মোট পুরুষ উত্তরদাতার ১৩.৩৩ শতাংশ। নারী উত্তরদাতাদের ২০ জন নিরক্ষর, যা মোট নারী উত্তর দাতার ১৬.৬৭ শতাংশ। পুরুষ উত্তরদাতাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১ম-৫ম শ্রেণী স্তর, যা মোট পুরুষ উত্তরদাতার ২৬.৬৬ শতাংশ। নারী উত্তরদাতাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১ম-৫ম শ্রেণী, যা নারী উত্তরদাতাদের ৪১.৬৭ শতাংশ। পুরুষ উত্তরদাতাদের সর্বনিম্ন সংখ্যা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে ২০ জন, যা মোট পুরুষ উত্তরদাতার ৩.৩৩ শতাংশ। নারী উত্তরদাতাদের সর্বনিম্ন সংখ্যাও স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে ৬ জন যা মোট নারী উত্তরদাতার ৫.০০ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

গ. পেশা

সারণী ৩.৩ ঃ উত্তরদাতাদের পেশার বিন্যাস

পেশা	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
কৃষি	২০০	৩৩.৩৩	০	৮.৩৩	২০০	২৭.৭৮
দিনমজুর	১৬০	২৬.৬৭	১০	১৬.৬৭	১৭০	২৩.৬১
চাকরি	৫০	৮.৩৩	২০	৮.৩৩	৭০	৯.৭২
শিক্ষকতা	৩০	৫	১০	৫০.০০	৪০	৫.৫৬
গৃহিনী	০	০	৬০	০	৬০	৮.৩৩
গ্রাম্য ডাক্তার	১০	১.৬৭	০	৮.৩৩	১০	১.৩৯
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৪০	৬.৬৭	১০	০	৫০	৬.৯৪
ভ্যান চালক	১৬	২.৬৭	০	০	১৬	২.২২
কাঠ মিস্ত্রী	১০	১.৬৭	০	০	১০	১.৩৯
রাইসমিলচালক	৬	১.০০	০	০	৬	০.৮৩
ঠিকাদার	১০	১.৬৭	০	০	১০	১.৩৯
জেলে	১০	১.৬৭	০	০	১০	১.৩৯
হল ভাঙ্গানো	৬	১.০০	৪	৩.৩৩	১০	১.৩৯
কামার	৬	১.০০	০	০	৬	০.৮৩
কুমার	১০	১.৬৭	০	০	১০	১.৩৯
অন্যান্য	৩৬	৬.০০	৬	৫.০০	৪২	৫.৮৩
মোট	৬০০	১০০	১২০	১০০	৭২০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৩.৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ উত্তরদাতার সর্বোচ্চ সংখ্যা ২০০ জন। তারা কৃষি পেশায় নিয়োজিত এবং তারা মোট পুরুষ উত্তরদাতার ৩৩.৩৩ শতাংশ। নারী উত্তরদাতার সর্বোচ্চ সংখ্যা ৬০ জন। তারা গৃহিনী এবং তারা মোট নারী উত্তরদাতার ৫০ শতাংশ।

ঘ. ভূমির পরিমাণ

সারণী ৩.৪ উত্তরদাতাদের ভূমি মালিকানার পরিমাণ

ভূমির পরিমাণ (শতক)	পুরুষ		নারী		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ভূমিহীন	১০০	৩৩.৩৩	০	৮.৩৩	১০০	২৭.৭৮
২০-৪০	৮০	২৬.৬৭	৫	১৬.৬৭	৮৫	২৩.৬১
৪১-৬০	২৫	৮.৩৩	১০	৮.৩৩	৩৫	৯.৭২
৬১-৮০	১৫	৫	৫	৫০.০০	২০	৫.৫৬
৮১-১০০	০	০	৩০	০	৩০	৮.৩৩
১০১-১২০	১০	১.৬৭	০	৮.৩৩	১০	১.৩৯
১২১-১৪০	৪০	৬.৬৭	১০	০	৫০	৬.৯৪
১৪১-১৬০	১৬	২.৬৭	০	০	১৬	২.২২
১৬১-২০০	১০	১.৬৭	০	০	১০	১.৩৯
মোট	৬০০	১০০	১২০	১০০	৭২০	১০০

সারণী ৩.৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ উত্তরদাতাদের ২৫ জন এবং নারী উত্তরদাতাদের ১৫ জন ভূমিহীন, যা যথাক্রমে মোট পুরুষ ও নারী উত্তরদাতার ৮.৩৩ ও ২৫ শতাংশ। পুরুষ উত্তরদাতাদের সর্বাধিক সংখ্যক ৭০ জনের ভূমির পরিমাণ ২০-৪০ শতক, যা মোট পুরুষ উত্তরদাতার ২৩.৩৩ শতাংশ। নারী উত্তরদাতাদের সর্বাধিক সংখ্যক ৩০ জনের ভূমির পরিমাণ ২০-৪০ শতক, যারা মোট নারী উত্তরদাতাদের ৫০ শতাংশ। ৫ জন নারী উত্তরদাতার ভূমির পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

৬১-৮০ শতক, যা মোট নারী উত্তরদাতার ৮.৩৩। পুরুষ উত্তরদাতাদের ১০ জনের জমির পরিমাণ ১৬১-২০০ শতক, যা মোট পুরুষ উত্তরদাতার ৩.৩৩ শতাংশ।

ঙ. আয়

সারণী ৩.৫ উত্তরদাতাদের পারিবারিক (বার্ষিক) আয় বিন্যাস

আয়ের পরিমাণ	পরিবারের সংখ্যা	শতকরা হার
<২০,০০০	২৩২	৩২.২৮
২০,০০১-৩০,০০০	১৮৪	২৫.৬১
৩০,০০১-৪০,০০০	১৪০	১৯.৩০
৪০,০০১-৫০,০০০	৬৩	৮.৭৭
৫০,০০১-৬০,০০০	৩৮	৫.২৬
৬০,০০১+	৬৩	৮.৭৭
মোট	৭২০	১০০

সারণী ৩.৫ এ উত্তরদাতাদের আয় সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে. অধিকাংশ উত্তরদাতার পারিবারিক বাৎসরিক আয় ১০ থেকে ১৯ হাজার টাকা । তাদের শতকরা হার ৩.২৮%।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশিকা

১. ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন চেকলিষ্ট ১১/০৭/২০০৪

২. ঝিনাই-বৈয়ান, একটি বিশেষ স্মরণিকা-১৯৯৬

৩. গোপালপুর থানা সমিতির একটি প্রকাশনা-তারিখ বিহীন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে সুশাসন; সমস্যা ও সম্ভাবনা

৪.১ সুশাসনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ধারা

৪.২ সুশাসন

৪.৩ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য

৪.৪ বিভিন্ন ধরনের সুশাসন

৪.৫ অপশাসন ও তার বৈশিষ্ট্য

৪.৬ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা

৪.৭ বাংলাদেশে সুশাসনের সম্ভাবনা

Dhaka University Institutional Repository

নব্বই দশকের শুরুতে আবির্ভূত শাসন (Governance) তথা সুশাসন (Good Governance) ধারণাটি আজ সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোচিত একটি বিষয় হিসেবে উন্নত এবং অনুন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর রাষ্ট্রচিন্তাবিদ, সিভিল সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তথা সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রধান আলোচ্য এবং গবেষণার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। শাসক বা সরকারের কাজ ও ক্ষমতার প্রয়োগ হিসেবে সাধারণ অর্থে 'শাসন' বিষয়টি বিদ্যমান। একটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার জন্য সুশাসন অত্যন্ত জরুরী। কারণ, গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তুলতে এবং গণতন্ত্রায়নের প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দেবার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করা আবশ্যক। কারণ, একটি দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার ওপরই সুশাসনের কার্যকারিতা নির্ভলশীল। কোন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক। শাসন সমীক্ষকদের দৃষ্টিতে সঙ্কট, অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতা বিদ্যমান শাসন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়। মৌল কোন পার্থক্য না করে শাসন এবং সুশাসন একই অর্থে ব্যবহার করা হয়। ব্যাখ্যার বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও শাসন প্রত্যয়টি কতিপয় ক্ষেত্রে সুশাসন ও অপশাসন (Bad Governance) এর আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। শাসক বা সরকারের কাজ ও ক্ষমতার প্রয়োগ হিসেবে সাধারণ অর্থে 'শাসন' বিষয়টি পূর্বেও বিদ্যামন ছিল। [১]

৪.১ সুশাসনের ক্রমিবিকাশ ঃ ধারণার উৎপত্তি ও বিবর্তন ধারা

১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।[২] এতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুন্নয়নের কারণ চিহ্নিত হয়। আর এর কারণ হলো সুশাসনের অভাব। দাতা সংস্থা সুশাসনকে আবশ্যিকভাবে সরকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেখে । নব্বই দশকের প্রথমদিকে বিশ্বব্যাংক সুশাসন ধারণা প্রায়োগিক করে তোলে এবং কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। [৩]

১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংকের দৃষ্টিতে সুশাসনের গঠন উপাদান হিসেবে তিনটি বিষয়কে দেখা হয় ঃ

ক. **The Form of the Political Regime;**

খ. **The Process of Managing Economic and Social Resources and**

গ. **The Capacity of Formulate and Implement policies and discharge governmental Functions.** [৪]

প্রাথমিকভাবে বিশ্বব্যাংক এবং পরবর্তীতে অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষায় সুশাসন একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে প্রায়োগিক আবেদন সৃষ্টি করে। [৫]

Dhaka University Institutional Repository

শাসন তথা সুশাসনের অভীষ্ট লক্ষ্য হিসেবে ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অগ্রগণ্য। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বিভিন্ন এপ্রোচ বদলের মধ্যদিয়ে শাসন প্রক্রিয়াকে জনকল্যাণমুখী করণের লক্ষ্যে সুশাসনের বিবর্তন নিম্নরূপ ঃ

১. বিকেন্দ্রীক সুশাসন **(Decentralized good Governance)**

২. অংশীদারিত্বমূলক সুশাসন **(Shared good Governance)**

৩. সুশাসন **(Good Governance)**

১. বিকেন্দ্রীক সুশাসন ঃ বিকেন্দ্রীকরণ হলো কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা, কার্যক্রম, দায়িত্বশীলতা বা সম্পদ বিভিন্ন মাত্রায় স্থানান্তর করা। [৬] জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞায় বিকেন্দ্রীকরণ হলো ঃ **"The Transfer of authority on a geographic basis whether by deconcentration (i. e. delegation) of administrative authority of field units of the same department or level of government, or by the political devolution of authority to local government units or special statutory bodies.** [৭]

১৯৬০ এর দশকে জাতিসংঘের একটি সমীক্ষায় চার ধরনের বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলা হয়েছে। যথাঃ

ক. ব্যাপক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা **(Comprehensive local government system)**

খ. দ্বৈত ব্যবস্থা **(Dual System)**

গ. সমন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা **(Integrated Administrative system)** [৮]

ক. ব্যাপক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ঃ এ ব্যবস্থায় স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের অধিকাংশ সেবা বহুমূখী উদ্দেশ্য সম্পন্ন স্থানীয় কর্তপক্ষের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়।

খ. অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থা ঃ এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ের এককসমূহে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে কতিপয় প্রত্যক্ষ সেবার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ. দ্বৈত ব্যবস্থা ঃ এ ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সম্পন্ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তৃণমূল সেবা সমূহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় সমূহের সহযোগীতায় সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্থানীয় উন্নয়নে ব্যাপক পরিসরে সাফল্য কম ক্ষেত্রেই আসে।

ঘ. সমন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি সেবা আঞ্চলিক সমন্বয়কারী বা জেলা প্রশাসকগণের সহায়তায় মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সারকারী কর্মকাণ্ড বা কর্মচারীদের উপর গ্রামীণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নূন্যতম নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে। [৯]

পরবর্তীতে **Brian C. Smith** সরকারের মাঠ পর্যায়ে এককসমূহের বিকেন্দ্রীকরণে তিনটি ভিন্ন আঙ্গিক চিহ্নিত করেন। যথা ঃ

ক. **Functional System.**

খ. **Integrated Prefectoral system.**

গ.**Un-integrated Prefectoral system.** [১০]

ক. **Functional System** : এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের মাঠ প্রতিনিধি পৃথক কার্যগত স্তরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কৃষি বিষয়ে সরকারী নীতিসমূহের জন্যে দায়িত্বশীল থাকেন। যুক্তরাজ্যে এ ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

খ. **Integrated Prefectoral System:** এক্ষেত্রে সাধারণত রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষে প্রশাসনিক কর্মকর্তা **(Prefect)** প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মাঠ পর্যায়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে সকল মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কার্যাদির সমন্বয় করেন। এ ব্যবস্থায় তিনি কেন্দ্রের কাছে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকেন।

গ. **Un- interested Prefectoral system:** এ ব্যবস্থায় স্থানীয় ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যাবলী প্রশাসনিক কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন করেন। তিনি প্রধান কার্যালয়ের সিদ্ধান্তসমূহ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এ ব্যবস্থায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার মধ্যে নিয়মিত এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তিও হতে পারে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রশাসনিক কর্মকর্তার অধীন নন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মকর্তার সম্পর্ক তাঁর Territorial Jurisdiction এর ওপর ভিত্তিশীল। [১১]

Dhaka University Institutional Repository

২. অংশীদারিত্বমূলক সুশাসন ঃ স্থানীয় অংশগ্রহণের রাজনীতির ধারায় রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া তৃণমূল গণতন্ত্রের (Grass Roots Democracy) ভিত্তি শক্তিশালী করে থাকে। অংশীদারিত্বমূলক সুশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরোক্ষ হয়ে থাকে। [১২]

৩. সুশাসন ঃ প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান শাসন কাঠামোর দুর্বলতা ও অসামঞ্জস্য থেকে উদ্ভূত হয় অপশাসন (Misgovernance) । উন্নয়ন বিতর্কের আলোকে শাসন কাঠামোকে অধিকতর জনকল্যাণমুখী, উন্নয়ন উপযোগী এবং জেন্ডার উপাদান সম্বলিত করার লক্ষ্যে নব্বই দশকে দাতা সংস্থা ও বিভিন্ন এজেন্সী সুশাসন ধারণাটি গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ১৯৯৯ সালের মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে মানব শাসন সূচকের (Human Governance Index-HGI) সুপারিশ করা হয়। [১৩]

মানবিক শাসনের তিনটি ধারা রয়েছে এবং এই ধারাগুলো ধারণাগত দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ধারা গুলো হলো ঃ

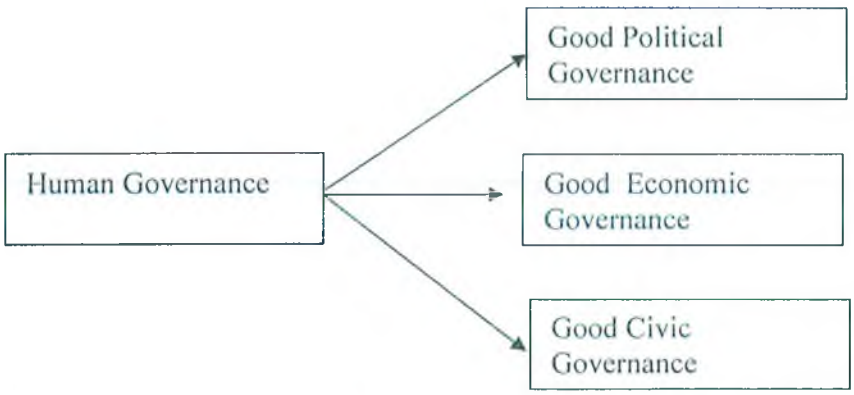

রাজনৈতিক সুশাসন ঃ রাজনৈতিক সুশাসনের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান, নয়া উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন যন্ত্রকে সেবা যন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা, অবাধ নিরপেক্ষ ও বহুদলীয় নির্বাচন ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক বহুত্ববাদ, সিদান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, নীতি প্রণেতা ও বাস্তবায়নকারীদের স্বাচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক সুশাসন ঃ অর্থনৈতিক সুশাসন বলতে বুঝায় ব্যাষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজস্ব ও আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক সাম্য, সামাজিক অগ্রাধিকারমূলক খাতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, ভর্তূকি প্রদান, ঋণ ও ভূমির অধিকারে ও বাজারে সম-প্রবেশগম্যতা।

নাগরিক সুশাসন ঃ নাগরিক সুশাসন জনসমাবেশায়ন, নির্বাচন শিক্ষা, জনগণের ক্ষমতায়ন, পরিবার ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্বশীলতা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক পুঁজি (Social Capitalism) এবং যৌথ সামাজিক দায়িত্বপালন এবং স্থানীয় অনানুষ্ঠানিক বিচার-সালিশ প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকে।[১৪]

৪.২ সুশাসন ঃ

প্রকৃতপক্ষে শাসন **(Governance)** ধারণাটি দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. সুশাসন **(good Governance)**

২. অপশাসন **(Bad governance)**

সুশাসন এবং অপশাসনকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছে। সুশাসন আলোচনার পূর্বে শাসন সম্পর্কে আলোচনা করা যায়।

Landell-Mills, P. and Serageldin, I., এর মতে "শাসন হলো জনগণ কিভাবে শাসিত হয়; কিভাবে রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কিভাবে তা জনপ্রশাসন ও আইনের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে।[১৫]

Oxford Dictionary অনুযায়ী -"শাসন হলো শাসন করার কাজ বা উপায় কাজ সম্পাদনের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মনীতিমূলক পদ্ধতি।"

অধ্যাপক রেহমান সোবহানের মতে, "শাসন হচ্ছে একটি প্রায়োগিক প্রক্রিয়া যা প্রভাবিত করে জননীতির ফলাফলকে।"

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিজ্ঞান বিশ্বকোষ অনুযায়ী শাসন বিষয়টি সংজ্ঞায়নে তিনটি পরিভাষা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। [১৬]

প্রথমটি হচ্ছে জবাবদিহিতা **(Accountability),**যাতে শাসক কর্তৃক শাসিতের উপর প্রভাবের কার্যকারিতা নিশ্চিত হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে বৈধতা **(Legitimacy),** যাতে নাগরিকদের উপর ক্ষমতা চর্চায় রাষ্ট্রের অধিকার এবং এই ক্ষমতা চর্চা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তা টেনে দেয়া সীমারেখা দেখা হয় এবং তৃতীয়টি হচ্ছে স্বচ্ছতা **(Transparency),** যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণের উপর ভিত্তিশীল। [১৭]

সুশাসন ঃ সাধারণ সুশাসনের অর্থ এমন একটি আদর্শ শাসন ব্যবস্থা যা একটি দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য প্রণীত কার্যক্রমে যথাযথ জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দেবে। বর্তমানে উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক দিক সহ এর সাথে সংশিষ্ট সকল বিষয়ে দক্ষতা ও নৈপুন্যের ভিত্তিতে পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে আমরা সুশাসন বলতে পারি।

G. Bilney এর মতে, সুশাসন হচ্ছে - **"The effective management of a country's social and economic resousces in manner that is open, transparent, accountable and equitable.** [১৮]

মারটিন মিনোগের মতে সুশাসন হচ্ছে "সরকারকে আরো বেশি গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সক্রিয় করার ব্যাপারে সুশাসন বৃহৎ অর্থে কতিপয় উদ্যোগের সমাহার ও একটি সংস্কার কৌশল। [১৯]

The Social Science Encyclopedia তে সুশাসন সম্পর্কে বলা হয়েছে-**It is a broader concept than government, which is specifically concerned with the role of political authorities in maintaining social order within a defined territory and the exersise of executive power."** [২০]

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসনের সবচেয়ে ব্যবহার উপযোগী সংজ্ঞা দিয়েছেন-**Mc Corney** .তিনি বলেন-**"Governance is the relationship between civil society and the state, between government and governed, the ruler and ruled."** [২১]

সুশাসন ধারণাটির সাথে কতগুলো প্রতিষ্ঠান জড়িত রয়েছে যেমন ঃ

ক. কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় সরকার এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল।

খ. রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী যা সরকার পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করে।

গ. সিভিল সমাজ নিজস্ব ও জনগণের একাংশের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট।

ঘ. উন্নয়ন এনজিও সেবা সংস্থা যারা নিজস্ব কাজে অর্থায়ণকারী প্রতিষ্ঠানের মতামত প্রতিফলিত করে এবং

ঙ. জনগণের অসংগঠিত এবং গ্রামীণ অংশ। [২২]

সুশাসনের নির্দেশক হিসেবে **Sir Kanneth Stwoe** নিচের বিষয় গুলোর কথা বলেছেন-

ক. বাক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা;

খ. সংবিধান ও বিচার বিভাগ কর্তৃক জনগণের অধিকার সংরক্ষণ;

গ. স্বাধীন আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন;

ঘ. মুদ্রার স্থিতিশীলতা;

ঙ.শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে জড়িত উন্নয়ন; এবং

চ. স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত আইনসভার নিকট নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা। [২৩]

সুশাসন নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও নির্দেশ করে। যথা ঃ

ক.সরকারের গুণাগুণ বিচার

খ. রাষ্ট্রীয় কার্য ব্যবস্থাপনায় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ;

গ.রাষ্ট্রের উন্নয়নে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতা প্রয়োগের ধারা এবং

ঘ.রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় নিয়ম ও কর্তৃত্ব প্রয়োগের ধারা। [২৪]

Dhaka University Institutional Repository

অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (OCED) এর উন্নয়ন সহায়ক কমিটি (Development Asisstance Committee- DAC) ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে সুশাসন, অংশগ্রহণ মূলক উন্নয়ন, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রায়নের মধ্যে নিম্নলিখিত আন্তঃসম্পর্ক দেখিয়েছেন-

ক. সরকারের বৈধতা শাসিতের সম্মতি এবং অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার বিদ্যমানতার উপর নির্ভর করে।

খ. সরকারী কর্মকান্ডে সরকারের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় উপাদানের জবাবদিহিতা, তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা এবং ব্যক্তির আচরণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।

গ. জবাবদিহিতা রাজনৈতিক পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বজায় থাকে।

ঘ. যথার্থ নীতি প্রণয়নে সরকারের দক্ষতা, সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এসব কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন, সমান সেবা বিতরণ, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা, আইনের শাসন, ব্যাক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, কার্যকর অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক কর্মকান্ড এবং ব্যক্তির অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকবে। [২৫]

Linz and stepan সুশাসন বিষয়ক পাঁচটি অন্তঃসম্পর্কযুক্ত কাঠামোর কথা বলেছেন। যথা-

ক. **A Robust civil Society;**

খ. **An Autonomus Political society;**

গ. **Rule of Law;**

ঘ. **An Efficient and Responsive Bureaucracy;**

ঙ. **An Economic society;**

সাম্প্রতিক এক রচনায় উপরোল্লিখিত পাঁচটির সঙ্গে তিনটি মাত্রা যোগ করা হয়েছে। যথাঃ

ক. **Public Integrity system;**

খ. **A Decentralized local governmental system;**

গ. **A free Media.** [২৬]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩ সুশাসনের বৈশিষ্ট্য ঃ

ইউএনডিপির টেকসই মানব উন্নয়ন কর্মশালায় সুশাসনের যেসব বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

১ অংশগ্রহণমূলক

২ জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল

৩ সম্পদ উন্নয়নে ও সুশাসন পদ্ধতি উন্নয়নে সক্ষম

৪ সামাজিক উদ্দেশ্যে সম্পদ আহরণে সক্ষম

৫ আইনের শাসন দ্বারা পরিচালিত

৬ সম্মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করে

৭ সহায়ক ও সহজতর করা

৮ নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বিধিসম্মত করা

৯ সেবামুখী

১০ টেকসই

১১ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য

১২ সাম্য ও সমতাবিধান

১৩ জেন্ডার ভারসাম্যমূলক

১৪ বিভিন্ন ও ভিন্নমুখী প্রেক্ষিতকে ধারণ ও গ্রহণে সামর্থ্য

১৫ দক্ষ ও কার্যকর

১৬ জবাবদিহি

১৭ জাতীয়ভিত্তিক সমাধান দান ও মালিকানা গ্রহণে সক্ষম

১৮ সাময়িক বিষয়সমূহ নিষ্পত্তিতে সক্ষম এবং

১৯ যেসববিষয়ে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কম সেগুলো সীমিতকরণ।[২৭]

Dhaka University Institutional Repository

অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD)সুশাসনের কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে। এগুলো হলো ঃ

১ গণতন্ত্রের উন্নয়ন ও মুক্ত বহুত্ববাদী সমাজ

২ অবাধ ও প্রবেশগম্য আইন ও বিচার ব্যবস্থাসহ আইনের শাসন শক্তিশালী করা।

৩ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা জোড়ালো করা

৪ দূর্ণীতি বিরোধী উদ্যোগ

৫ স্বাধীন গণমাধ্যমের উন্নয়ন ও তথ্য প্রচার এবং

৬ অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় হ্রাসের প্রচেষ্টা। [২৮]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ বিভিন্ন ধরনের সুশাসন ঃ

বৈশ্বিক সুশাসন (Global Good Governance)

বর্তমানে 'রাষ্ট্র' জাতি -রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক স্বার্থ ও নীতির একটি বিশ্বজনীন রূপধারণ করেছে। তথ্য ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বিশ্ব সমাজ ও রাষ্টসমূহ মার্শাল ম্যাকলুহান বর্ণিত বৈশ্বিক গ্রামে (**Global Village**) পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বদলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক শক্তিকেন্দ্র হয়ে গড়ে ওঠা এবং পুঁজিবাদী আধুনিকায়ন তত্ত্বের (**Capitalist Modernization theory**) দ্বারা মার্কিন স্বার্থ নিশ্চিত করা, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি বৈশ্বিক শাসনের বাতাবরণ তৈরী করেছে। বৈশ্বিক পর্যায়ে বিভিন্ন নীতি ও কর্মতৎপরতার ফলে জাতিসংঘ, ইউএনডিপিসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন, দাতা, উন্নয়নসহযোগী, বহুজাতিক কোম্পানী, রাজনৈতিক বলয় প্রভৃতি বৈশ্বিক শাসনের ভিত্তি তৈরী করেছে। এ অবস্থাটাকে বলা যায়**'Governing without government.'**

দাতাগোষ্ঠীর বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের ধারায় যে শাসন ও সুশাসনের রূপরেখা দাড় করানো হয়েছে-নিচের উদ্ধৃতির মাধ্যমে তার কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে।

The five care areas- poverty eradication, food security, trade co-operation, payments union and external resource mobilisation -are not only closely inter - related, but also neassary prerequisites for achieving the vision of a---- Economic community with sustainable human development, real democratic political formations, good governance and poverty eradication. [২৯]

স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক সুশাসন বিষয়ে **Commission on Global Governance** এর উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত **Our Global Neighbourhod** প্রতিবেদনে বৈশ্বিক সুশাসনে নির্দিষ্টভাবে পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করা হয় ঃ

১ সুশাসন পরিবর্তন এবং বহুমূখী মূল্যবোধের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া।

২ নিরাপত্তার বিষয়টি বাস্তবোচিতভাবে নিশ্চিত করা।

৩ অর্থনৈতিক আন্তনির্ভরশীলতা উপলব্ধি

Dhaka University Institutional Repository

৪ জাতি সংঘের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন এবং

৫ বিশ্বব্যাপী আইনের শাসন জোরদার করণ। [৩০]

জাতীয় সুশাসন ঃ (National good governance)

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন উপাদান, রীতিসিদ্ধ কাঠামোর ক্ষমতা চর্চা করে। স্থানীয় সুশাসন ব্যবস্থার একটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, জনঅংশীদারিত্বমূলক ভূমিকায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মধ্যদিয়ে জাতীয় সুশাসনের বুনিয়াদ দৃঢ় করে। জাতীয় পর্যায়ে সরকারী ব্যবস্থার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা, মিতব্যয়িতা, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, আইনের শাসন, অংশগ্রহীতা ধারা, সম্পদ উন্নয়ন, দুর্নীতিরোধে ও অবাধ গণমাধ্যম প্রভৃতি জাতীয় সুশাসনের অন্যতম ভিত্তি। [৩১]

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের অদক্ষতা, জবাবদিহিতা, অস্বচ্ছতার ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত শাসন সমস্যা নিয়ে উন্নয়ন সহযোগী দাতা সংস্থাসমূহ বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কার কার্যের সুপারিশ করে থাকে। জাতীয় সুশাসন প্রক্রিয়া বহিঃশক্তির নীতি ও কর্মসূচীর প্রভাবে জাতীয় শাসন কাঠামোর দক্ষতা, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণের দিকে নজর দেয়। সিভিল সমাজের গঠনমূলক ভূমিকা জাতীয় সুশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে। সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়াসে নিবেদিত একটি জাতীয় সরকার সিদ্ধান্ত ও কাজের মধ্যদিয়ে জাতীয় সুশাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। [৩২]

ই-সুশাসন (E-good Governance)

তথ্যের অবাধপ্রবাহ এবং স্বাধীন গণমাধ্যম একটি মুক্ত ও বহুত্ববাদী সমাজের অন্যতম পূর্বশর্ত। প্রশাসনিক, রাষ্ট্রীয় ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের সেবামুখীকরণের অন্যতম উপায় সরকারী তথ্যের সহজপ্রাপ্যতা এবং তথ্য ভান্ডারের সুবিধা কম খরচে আয়ত্ব করার মধ্যে নিহিত। সরকারী সেবা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার দিক নির্দেশনা হিসেবে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসনের উদ্ভবের ফল হিসেবে জন প্রশাসনের চিরাচরিত ভূমিকা বদলে যেতে শুরু করেছে। সরকারী প্রশাসনের একটি বাড়তি উদ্যোগ হিসেবে এই নতুন শাসন বা ই-সুশাসনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ই-সুশাসনের প্রত্যক্ষ হিসেবে জনগণের বাসগৃহে সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। [৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

অনানুষ্ঠানিক সুশাসন (Informal good governance)

অনানুষ্ঠানিক সুশাসনের সুনির্দিষ্ট কোন রূপরেখা নেই। অনানুষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থায় আইনগত ক্ষমতার বিষয়টি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। উদাহরণ হিসেবে সালিশ ব্যবস্থার কথা বলা যায়, যা অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পাশা-পাশি ঐতিহ্যগতভাবে চলে আসছে। অনেকে অনানুষ্ঠানিক সুশাসনকে সিভিল সমাজ ও এনজিওতে সীমীত করে ফেলে। বাংলাদেশ অনানুষ্ঠানিক শাসন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার অতীত ভূমিকা ধরে রাখতে পারছেনা। গ্রামীণ পর্যায়ে বিভিন্ন সহযোগীতার মাঝে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের মুখাপেক্ষীকরণের কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠিত সামাজিক উদ্যোগগুলোর ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক সুশাসনের কিছু উদাহরণ নীচে দেয়া হলো ঃ

১ রাস্তা প্রশস্তকরণ;

২ ঋণ এবং সঞ্চয়ী সমাজ গঠন ও ব্যবস্থাপনা;

৩ আবর্জনা অপসারণ, কমিউনিটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার;

৪ মসজিদ, কবরস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, ক্লাব, হাট বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা;

৫ সামাজিক বনায়ন, কচুরিপানা পরিষ্কার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, দাফন কার্য এবং মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা;

৬ পারিবারিক বিষয়, ভূমি বিরোধ, ঋণ সম্পর্কিত বিরোধ ও শারীরিক আঘাত নিয়ে সালিশ ব্যবস্থা;

৭ মাদকাশক্তি, মাস্তানি, বল প্রয়োগ বা হুমকি প্রদর্শন করে কিছু আদায়ের বিরুদ্ধে কমিউনিটির পদক্ষেপ;

৮ বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের দূর্নীতি ও নিম্নতম সেবার বিরুদ্ধে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রতিবাদ;

৯ জরুরী অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পারস্পরিক সহযোগীতা

১০ ছোটখাট বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, নালা তৈরী এবং পানি সেচকর্ম প্রভৃতি। [৩৪]

বাংলাদেশে নয় ধরনের অনানুষ্ঠানিক সুশাসন চিহ্নিত করা হয়েছে। যেমন-

১ অনানুষ্ঠানিক সুশাসন অতীত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা হিসেবে বিদ্যমান। যেমন-গ্রাম সালিশ।

২ যেখানে অনানুষ্ঠানিক শাসন ব্যবস্থা জনগণকে রক্ষায় অসমর্থ, সেখানে কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা।

৩ যেখানে অনানুষ্ঠানিক শাসন ভৌত বাধার কারণে পৌঁছুতে অসমর্থ যেমন- বঙ্গোপসাগরে দূরবর্তী দ্বীপসমূহ।

Dhaka University Institutional Repository

৪ বন্যা, যুদ্ধ, সাইক্লোন, ভূমিকম্পন, নদীভাঙ্গন, শরনার্থী, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি জরুরী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনানুষ্ঠানিক সুশাসনের সাড়া দেয়।

৫ স্থানীয় সরকার সমূহ কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরকারী পানি ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করা।

৬ এনজিও'র মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্বীয় ব্যবস্থাপনায় পল্লী এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক সুশাসনে সক্রিয় রয়েছে।

৭ যেখানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সুশাসন সহাবস্থান করে রয়েছে। যেমন-অনানুষ্ঠানিক সালিশ এবং অনানুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থা।

৮ যেখানে আনুষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের বিরূদ্ধে কমিউনিটির অধিকার রক্ষায় সক্রিয় যেমন-৯৫ সালে সার বিতরণে অব্যবস্থার বিরূদ্ধে কৃষকদের স্বতঃস্ফুর্ত প্রতিবাদ।

১০ যেখানে অনানুষ্ঠানিক শাসন অনগ্রসর ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ নেয় এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। [৩৫]

স্থানীয় সুশাসন (Local good governance)

স্থানীয় সুশাসন তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও শাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্পর্ক, সামাজিক পুঁজি, যৌথ সামাজিক দায়দায়িত্ব, স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়কে ধারণ করে। স্থানীয় সুশাসনে একই সাথে আনুষ্ঠানিক কাঠামো ও অনানুষ্ঠানিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। অনানুষ্ঠানিক সুশাসনের বিভিন্ন দিক ও ধরণসমূহ স্থানীয় সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। স্থানীয় সুশাসনের ইস্যুগুলো হলো ঃ

(ক) নির্বাচিত স্থানীয় সরকার কাঠামোর জনগণের কম সুবিধাপ্রাপ্ত অংশ, নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে দরিদ্র ও নারীদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং এই সময়ে দীর্ঘ ও স্বল্প স্বার্থ রক্ষায় সুদক্ষভাবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা।

(খ) স্থানীয় নির্ধারিত সরকার কাঠামোগুলোর প্রশাসনকে স্থানীয় জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা।

(গ) রাজস্ব ও কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিকাংশ মৌলিক প্রয়োজন যেমনঃ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রাথমিক শিক্ষা, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কার্যকর ও পর্যাপ্তভাবে সম্পন্ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) এনজিও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, সমবায় এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বিষয়ে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। [৩৬]

স্থানীয় সুশাসনের ক্ষেত্রগুলো সুনির্দিষ্ট করা কঠিন। কেননা, স্থানীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে বিভিন্ন লোকজ ঐতিহ্য ও অনানুষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকে। জাতীয় গণমাধ্যম সমূহ স্থানীয় বিষয়সমূহ উপস্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় সুশাসনে ভূমিকা রাখে।

৪.৫ অপশাসন ও তার বৈশিষ্ট্য ঃ

শাসনকে সুশাসন ও অপশাসন এই দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। সুশাসনকে ব্যাখ্যার প্রয়োজনেই অপশাসনের আলোচনা চলে আসে। সুশাসনের বিপরীত অবস্থা হিসেবে অপশাসনে যুক্ত রয়েছে রাষ্ট্রের অদক্ষ ভূমিকা, স্বচ্ছতার অভাব, জবাবদিহিতার অভাব, আইনের শাসনের দুর্বলতা, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সংবিধান লংঘন, নিম্ন মানবাধিকার দূর্নীতি ইত্যাদি।

অপশাসনের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

বিশ্বব্যাংক অপশাসনের নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেছে ঃ

১ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য নির্ধারণে ব্যর্থতা;

২ ব্যক্তি স্বার্থে সরকারী সম্পদ ব্যবহার প্রবণতা;

৩ সরকারী সম্পদের তালিকার অভাব,

৪ অতিরিক্ত নিয়মনীতি ও শর্ত;

৫ উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যহীন অগ্রাধিকার;

৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্থবিরতা;

৭ লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতা;

৮ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি;

৯ দায়িত্বশীলতার অভাব এবং

১০ বরাদ্দের অসম বণ্টন। [৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ঃ

সুশাসনের বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্নদেশে বিভিন্ন রকম। সুশাসনের বিষয়টি নির্ভর করে সেই দেশের জনসাধারণের জীবনযাপনের মান, সরকার পদ্ধতি, সংস্কৃতিসহ আরও নানা বিষয়ের ওপর। যেমন- পাশ্চাত্যের নাগরিকের কাছে যা স্বাভাবিক বাংলাদেশের নাগরিকের কাছে তা অতি সুশাসন। [৩৮]

সুশাসনকে যদি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয় তাহলে প্রথম পর্যায়টিকে বলা যায়- প্রদান বা ডেলিভারী। অর্থাৎ যারা ক্ষমতা বা ষ্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে জড়িত নয় তারা কী পাচ্ছে? বিশ্বব্যাংকের মতে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যা রুটিন ব্যাপার, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য তা নয়। যেমন- একটি পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া বা বিদ্যুত বা পানির সংযোগ লাভ। [৩৯] এ পর্যায়ে যদি কর জমা দেয়ার অধিকার বা সামান্য বিল মেটাতে গেলে যদি হয়রানি না হয় তাহলেই বাংলাদেশের মানুষ মনে করবে সে সুশাসন পাচ্ছে। [৪০]

এর পরের পর্যায় হচ্ছে, জনগণের ক্ষমতায়ন বা রাষ্ট্রীয়নীতিতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন। বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা নেপালের মানুষ এখনও সুশাসনের প্রথম পর্যায়ের স্বাদ পায়নি। ভারত বা শ্রীলংকা হয়তো দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কতোটা তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে তা সন্দেহজনক। [৪১]

সাধারণভাবে প্রথাগত রাষ্ট্রের উপাদান বলতে সংসদ, সরকার ও বিচার বিভাগকে বোঝানো হয়। আধুনিক সংজ্ঞায় এর সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যক্তি মালিকানা বা বেসরকারী খাত, স্থানীয় সরকার এবং সিভিল সমাজ।

বাংলাদেশে এখনও শাসনের মূল দায়িত্ব সরকারের নির্বাহী বিভাগের। যেখানে সহায়তা করবে সংসদ ও বিচার বিভাগ। কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থা বা এনজিও সেখানে অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্তিম দায়িত্ব বর্তায় সরকারের ওপর। অন্ততঃ জনগণ তাই মনে করে। কেননা, আইন এবং নির্বাহী বিভাগের আদেশের সাহায্যে সব দায়িত্ব সরকারই গ্রহণ করেছে। ঔপনিবেশিক কাঠামো না বদলানোই এর কারণ। যেমন, বাংলাদেশে কিছু এনজিও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কাজ করছে। কিন্তু, তাদের কাজ করতে হয় সরকারের হরেক রকমের বিধিনিষেধের আওতায়। অর্থাৎ, সে সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত হতে পারছেনা। সরকারের সুশাসনে সে সহযোগী মাত্র। যদি সরকারের বিধি নিষেধ না থাকতো তা হলে সে স্বায়ত্ত্বশাসিত হতো এবং সে ক্ষেত্রে নিজ কার্যের জন্য দায়বদ্ধ থাকতো। মানুষ এখন তার কাছে সুশাসন আশা করতো এবং তা না দিতে পারলে তাকে দায়ী করা যেতো (অর্থাৎ সুশাসনের অংশীদার হিসেবে)। এক্ষেত্রে তা যাচ্ছে না।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ঃ

বাংলাদেশে সুশাসনের যেসব সমস্যাগুলো দেখা যায় সে গুলো হলো ঃ

১ আমলাতন্ত্র নির্ভর সরকার ব্যবস্থা। এদেশের আমলারা সব সময় কাজ করে ভবিষ্যত সরকারের জন্য আর তাই প্রতিটি দলের নির্বাচনী ম্যানিফেষ্টোতে আমলাতন্ত্রের সংস্কারের কথা বলা হয়। কারণ; মানুষ সুশাসন চায় এবং মনে করে যে, সে যে সুশাসন পাচ্ছেনা তার একটি বড় কারণ আমলাতন্ত্র এবং রাজনীতিবিদদের কমিটমেন্টের অভাব [৪২]

২ বাংলাদেশে সুশাসনের আরেকটি অন্যতম সমস্যা দূর্নীতি।

৩ সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির পঁচিশ ভাগও কার্যকর হয় না। সেন্টার ফল পলিসি ডায়লগের (১৯৯৮) 'এ ক্রাইসিস ইন গভর্নেন্স' শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়, যে সব সংস্কার কার্যকর হয়নি তার অধিকাংশই শাসন সম্পর্কিত। এর অনেক গুলি উদ্ভূত অর্থনৈতিক অপরাধ থেকে। এ সব বিষয়ে ব্যবস্থা নিলে গুটিকয় (যারা এর সঙ্গে জড়িত) ছাড়া সাধারণ মানুষ সমর্থন করবে। [৪৩]

৪ দক্ষ ও অদক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাংলাদেশে সুশাসনের আরেকটি অন্যতম বাধা। আমাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উত্তরাধিকার এবং এর স্বরূপ পর্যালোচনা করলে তা আরও স্পষ্ট হয়ে আসে।

৫ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ এখনো সন্তুষ্টজনক অবস্থায় এসে পৌছেনি। বাংলাদেশের জনগণ এখনো রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছেনা। আর এটি সুশাসনের একটি সমস্যা।

৬ সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম শর্ত হলো সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ। অথচ, বাংলাদেশে এটির অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। সরকার তার কাজের জন্য জবাবদিহি করতে প্রস্তুত নয় এবং বিরোধীদলও এতে সরকারকে কোন চাপ বা সহযোগীতা করছেনা।

৭ বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি এদেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম বাধা। আমাদের দেশে গণতন্ত্র এখনও হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছে। এদেশে গণতন্ত্র সবেমাত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর তাই আমাদের যে রাজনৈতিক কৃষ্টি রয়েছে তা সুশাসনের অনুকূলে নয়।

৮ সুশাসনের একটি অন্যতম উপাদান হলো সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতণতা। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত বলে তারা রাজনৈতিক ভাবে সচেতন নয়। এখনো তারা কেবলমাত্র আবেগের বশবর্তী হয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে। তারা দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসম্পর্কেও সচেতন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

৯ দেশে সুশাসন স্থাপনের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রচার মাধ্যম গুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় জাতীয় প্রচার মাধ্যম গুলো যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে যায়। ফলে সরকারের ভাল এবং খারাপ, সফলতা এবং ব্যর্থতা গুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার কেউ থাকেনা।

১০ সুশাসন প্রতিষ্ঠার আরেকটি অন্যতম উপাদান হলো সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। রাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দেবার জন্য যে সব জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন তাদের অনেকের যোগ্যতা নিয়েই আমাদের দেশে প্রশ্ন রয়েছে। তাদের অনেকেই দেশ ও জনগণের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যস্ত, যা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম বাধা।

১১ একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি উপাদান। বাংলাদেশে প্রতিটি রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় যাবার আগে পৃথক বিচার ব্যবস্থার কথা বলে এবং ক্ষমতায় যাবার পর এত দীর্ঘ মেয়াদে তা বাস্তবায়নে চেষ্টা করে যে ক্ষমতায় থাকাকালীন মেয়াদে তা আর শেষ করা সম্ভব হয় না। সরকারের আন্তরিকতার অভাবেই দীর্ঘদিনেও কাজটি সম্পন্ন হয়নি।

১২ সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অন্তরায় হলো সামরিক বাহিনীর রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একুশ বছর সামরিক শাসন চলেছে। আর এ সময় বাংলাদেশে সৃষ্টি হয়েছে নতুন এক শ্রেণী, ঋণখেলাপী শ্রেণী যাদের থাবা থেকে দেশের অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি মুক্ত হতে পারেনি। [৪৪]

১৩ বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পূর্ণই আত্মকেন্দ্রীক। জনগণের স্বার্থের চেয়ে আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা নিজেদের কথা এবং নিজেদের দলের কথাই বেশী ভাবেন। এছাড়া সরকারী ও বিরোধীদলের প্রতিযোগীতাপূর্ণ মনোভাব, সহনশীলতার অভাব, পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভাবে বাংলাদেশে সুশাসন ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়াও রাজনীতিবিদদের কোন প্রকার দায়বদ্ধতা না থাকায় তারা দেশের প্রতি আন্তরিক নয় যা সুশাসনের পথে বাধা।

১৪ সরকারের তিনটি বিভাগ-আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ এদের মধ্যে কাজের সমন্বয়হীনতাও বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। বিরোধীদলের সংসদে বসে আলোচনা না করে রাজপথে কেবলই আন্দোলন করা এবং সরকারকে কোন কাজেই সহযোগীতা না করাও সুশাসন স্থাপনের অন্যতম বাধা।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ বাংলাদেশে সুশাসনের সম্ভাবনা ঃ

বাংলাদেশে সুশাসন এখনো প্রতিষ্ঠিত না হলেও এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায়না। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য স্থানীয় পর্যায় থেকে ধীরে ধীরে জাতীয় পর্যায়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে তার সুফল সাধারণ জনগণ ভোগ করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়েও তার সুফল পৌঁছে যাবে। নিচে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হলো ঃ

১ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার কার্যকর করলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সুশাসন নিশ্চিত করার বড় উপায় স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করা, জনগণকে ক্ষমতার অংশীদার করা। এভাবে পর্যায়ে পর্যায়ে সংসদে পৌঁছা। তাহলেই জনগণ যা চায় তা হবে। এবং সেটাই হবে তাদের মনমতো শাসন। যদি তা তাদের মনমতো হয় তা হলে সেটাই হবে সুশাসন। [৪৫]

২ সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে সব পর্যায়ে, বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে, স্বশাসিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকর থাকা। স্থানীয় সরকার হচ্ছে এমনি ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান যা রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে, জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে পারে। [৪৬]

৩ স্থানীয় সরকারের ভিত্তি হচ্ছে গণতন্ত্র। প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করে স্থানীয় সরকার স্থানীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে। এবং এর উদ্দেশ্য হতে পারে-

ক. স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনমানুষের রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব;

খ. স্থানীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় লিঙ্গের অংশীদারিত্ব;

গ. স্থানীয় বিচার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ;

ঘ. গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে শিক্ষা;

ঙ. নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ এবং

চ. সচেতনতা বৃদ্ধি, স্থানীয়ভাবে জনমত গঠন।

আর স্থানীয় পর্যায়ে রাজনীতিকে শক্তিশালী করে তুলতে পারলে সুশাসন স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্থাপন করা সম্ভব। [৪৭]

১ স্বাধীনতার তিনদশক পরও বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্থিতিশীল। রাজনৈতিক সমঝোতার অভাব, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার অভাব, আইন শৃংখলার অবনতি, মানবাধিকার লংঘন, আইনগত কর্তৃত্ব ও স্থানীয় শাসনের দুর্বলতা প্রভৃতিই হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শাসনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জ।[৪৮] এ প্রতিবন্ধকতা গুলো দূরকরা গেলে বাংলাদেশে সুশাসনের দ্বার খুব সহজেই উম্মোচিত হবে।

২ বাংলাদেশে স্থানীয় শাসনে গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে কেন্দ্র। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় কলোনির শাসনের অভিঘাত ছিল তীব্র। বহু বছর বহু চেষ্টার পরেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি কার্যকর মডেল নির্মাণ করা যায়নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ের সরকার গুলো এটি সংস্কারের চেষ্টা করে যাচ্ছে। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে আওয়ামী লীগ গঠন করে স্থানীয় সরকার কমিশন (স্থাসক) যা চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রস্তাব করে-গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ। প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য স্থানীয় সরকারের গণতন্ত্রায়ন।[৪৯] এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে পাশ হয়েছে স্থানীয় সরকার (গ্রাম পরিষদ) আইন।[৫০] ১৯৯৭ এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৯৭।[৫১] নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে পাশ হয়েছে উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮।[৫২]

গ্রাম পরিষদ আইন পাস করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ সরকার গ্রাম পরিষদ গঠন করেনি। পরবর্তীতে ২০০৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী চারদলীয় জোট সরকার গ্রাম সরকার বিল পাস করে। এভাবে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন পৌছে দেয়া সম্ভব।

১ যদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা যায় তাহলে স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব।

২ ইউনিয়ন পরিষদে অন্যান্য গ্রামীণ সংগঠনের সঙ্গে যৌথ সম্পর্কের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় অংশীদারিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন করে যৌথভাবে কর্মকান্ড সম্পাদনে এক পক্ষকে অপর পক্ষের কাছে দায়িত্বশীল, জবাবদিহিতাপূর্ণ, স্বচ্ছ ও দক্ষ হওয়ার নির্ভরশীলতা, প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিক কার্যকারিতা প্রদানে সক্ষম হবে। তবে এ ক্ষেত্রে দু'পক্ষের মধ্যে কোন মত বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

৩ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদর্শ বা দর্শন বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে এর স্তর কাঠামো, কার্যাবলী, উন্নয়নে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার কাঠামোর বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য থাকা প্রয়োজন।

৪ স্থানীয় সরকার কাঠামোর পূর্বতন ব্যবস্থার দূর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরসনের ব্যবস্থা করা এবং প্রতিষ্ঠান গুলোর অবকাঠামোগত সুবিধাদি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব।

৫ গ্রাম আদালতগুলোতে সহজসাধ্য ও প্রয়োগযোগ্য বিচারের বিধানাবলী নিশ্চিত করলে এটির ব্যবহার অনেকাংশে বাড়বে। যা সুশাসন নিশ্চিত করণে সহায়তা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ বিকেন্দ্রীকরণ, জনঅংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন, আইনের শাসন, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোর অংশ গ্রহণের বিধিসম্মত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৭ ইউনিয়ন পরিষদে, সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের কাজের বাধা অপসারণ এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়ে সরকারী নির্দেশনা যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে কিনা তা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তদারকি করতে পারেন।

৮ স্থানীয় সুশাসন নিশ্চিত করণে স্থানীয় বিভিন্ন কাঠামো/শক্তির অঙ্গীকার গুণগতভাবে বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৯ স্থানীয় সুশাসনের লক্ষ্যে তৃণমূলের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সামর্থ বিভিন্ন প্রশাসনিক, আইনগত, বিচারমূলক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১০ তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্রের উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ লালন, ভোটাধিকার সম্পর্কে সচেতণতা বৃদ্ধিতে গ্রাম ও ইউনিয়ন পরিষদ ভূমিকা পালন করতে পারে।

জাতীয় পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করার উপায় ঃ

১ সরকারের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

২ জনগণের মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য প্রবাহের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৩ দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৪ ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং বিচার ব্যবস্থার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

৫ মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অনিয়ম বা দূর্নীতি কাম্য নয়।

৬ শক্তিশালী ও সুগঠিত সিভিল সোসাইটি গঠন।

৭ দেশের জনগণ যদি তাদের নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে তাহলে সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব।

৮ দেশের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী উদ্দ্যোগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগেও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের অংশ নেয়া উচিত।

৯ সরকার গঠনের ক্ষেত্রে, সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ও ক্ষমতার হস্তান্তরের পদ্ধতি শান্তিপূর্ণ হওয়া এবং নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য নির্দেশিকা

১. আবুল বাশার মোহাম্মদ 'সুশাসন ও উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ পীর যাত্রাপুর গ্রাম একটি তৃণমূল সমীক্ষা"-এম, এস, এস, থিসিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

২. See International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) World Development report 1989, New York, Oxford University press, 1990.

৩. Theobald "The world Bank : Good Governance and the New Institutional Economics" in law and state, Vol, 59/61,1990

৪. I.P. Khosla, Governance and Difference in South Asian survey, A Journal of the Indian Council for South Asian Co-operation, Vol. 7, No.2, New Delhi, Sage publications, July-December 2000, P. 188.

৫. আবুল বাশার মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত

৬. Rondinelli, Denis A. Nellis, J. And Cheema, G., Shabbir. "Decentralisation in Developing Countries: A Review of Recent Experience" Working paper No 581, Washington D.C. World Bank, 1983.

৭. United Nations (UN), Decentralization for good Governance and Development Concepts and Issues, in Regional Development Dialouge (RDD), Vol. 21, No.1, Nagoya, Japan, Spring 2000, P.8.

৮. Walter O. Oyugi, "Decentralization for good governance and Devlopment concepts and Issues," in Regional Development Dialouge (RDD), Vol. 21.No.I, Nagoya, Japan, Spring 2000, P.8.

৯. আবুল বাশার মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত

১০. Smith, Brian C. Field Administration : An Aspects of Decentralization, London, Routledge and kegan paul, 1968.

১১. আবুল বাশার মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৩. Human Development in South Asia 1999, The Crisis of Governance, Dhaka, University press ltd. 1999.

১৪. আবুল বাশার মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত

১৫. Landell-Mills, P. and Serageldin, I., "Governance and the External Factor," Proceding of the world Bank Annual Conference on Development Economics, 1991, washinton, D.C., The World Bank. P. 304.

১৬. Robinson, Mark kuper, Adam and kuper, Jessica (eds.), The Social Science Encyclopedia, 2nd edition, Routledge, New york 1996, P. 347.

১৭. আবুল বাশার মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত

১৮. Bilney, G., "Good Governance and participatory Development in Australia's Aid Programme," Development Bulletin, Vol. 32, October, 1994, Page-17

১৯. Human Development in South Asia 1999, The Crisis of Governance, Dhaka, University Press Ltd., Dhaka, 1999.

২০. Robinson, Mark Kuper, Adam and Kuper, Ibid.

২১. Mc Corney, P.L., Cities and Governance : New Directions in Latin America, Asia and Africa, Toronto, centre for urban and community Studies, University of Toronto, 1998, pp. 195-196

২২. মোরশেদ, ড. মাহবুবুর রহমান, "সুশাসন ও উন্নয়ন," আব্দুল লতিফ মাসুম (সম্পাদিত), একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশঃ সার্বিক উন্নয়ন সমীক্ষা, ঢাকা, আফসার ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী ২০০১, পৃঃ ৫৩

২৩. বেগম নীলুফার, আহমদ, সাইফুদ্দীন, বাংলাদেশে সুশাসন সমস্যা ও সম্ভাবনা, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, সংখ্যা ৬৫, পৃ. ৮৪

২৪. Hye, Hasnat Abdul (ed.), Governance : South Asian, perspectives, Dhaka University press ltd. 2000, p.2

২৫. Bilney, G., Op, cit., P. 16

২৬. Zafarullah, Habib, "Consolidating Democratic governance : One step Farword, Two Step Back" in Alauddin, M. and Hasan, Samirul, (eds.)op. cit., P. 184

Dhaka University Institutional Repository

২৭. Guhatakurta Meghna & Karim Shahnaz, "Perceptions of Governance by Bilateral And Multilateral Donors" in Jowards of Theory of governance and Development learing from east Asia (ed.) Rehman Sobhan, Dhaka, UPL, 1998, PP. 80-81

২৮. OECD, OP. Cit.

২৯. Ponna, Wignaraja, "Towards a Transitional Strategy or good Governance and poverty Eradication" in South Asia, South Asia Economic Journal, Vol, 1, No.1, March 2000, P. 140

৩০. Commission on global governance, " Our global Neighbourhood," Oxford University Press, 1995. P.২

৩১. আবুল বাশার মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. প্রাগুক্ত

৩৪. প্রাগুক্ত

৩৫. Siddique Kamal, Local Governance in Bangladesh. Leading Issues and Major Challenges, Dhaka University Press Ltd, 2000, PP-135-136

৩৬. Siddiqui, Kamal, Op. cit., p. 129.

৩৭. World Bank, op. cit., P. 9

৩৮. মামুন মুনতাসীর, দক্ষিণ এশিয়ায় শাসন : বাংলাদেশে সুশাসন, সমাজ নিরীক্ষণ, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র সংখ্যা ৭৬, পৃঃ ৬৬

৩৯. World Bank, Bangladesh : Government that works, Dhaka 1996

৪০. মামুন মুনতাসীর প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৭

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭

৪৩. মুনতাসির মামুন- বই-তথ্য পঞ্জিকা-১৩

৪৪. মামুন মুনতাসীর, প্রাগুক্ত. পৃঃ ৭১

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮০

৪৬. প্রাগুক্ত

৪৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ: ৮১

৪৯. প্রাগুক্ত

৫০. Goprob, Local Government (Gram Parishad) act, Dhaka, 1997

৫১. Goprob, Local Government (Union Parishad, Second Amendment) Act, Dhaka, 1997.

৫২. Goprob, UPazila Parishad Act. Dhaka,1998.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টি, সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

৫.১ ভূমিকা

৫.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণার বিকাশ

৫.৩ বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ

৫.৪ গ্রামীণ জনগণের রানৈতিক কৃষ্টি

৫.৫ ঝাওয়াইল ইউনিয়নের নারী পুরুষের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ

৫.৬ সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতাঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

৫.৭ সচেতনতার ব্যাপ্তি

৫.৮ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

৫.৯ উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নশীল বাংলাদেশের জনচরিত্রের সাধারণ প্রবণতা ও মনস্তাত্ত্বিক মাত্রা বোধের প্রকাশ ঘটেছে এর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সংস্কৃতিতে। বাংলাদেশের জনগণের হাজার বছরের লালিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটেছে এদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ বিশেষণে দেখা যায় বিভিন্ন প্রয়াস ও বিচ্যুতির (trial and error) মধ্যদিয়ে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। যদিও এখন পর্যন্ত ব্যাকরণসম্মতভাবে বা প্রথাসিদ্ধভাবে আমাদের সমাজে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা সিভিক কালচার গভীরভাবে শিকড় গাড়েনি। তবুও গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ বাঙালীর মানসে জেঁকে বসে আছে।[১] একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুসারেই সাধারণত সে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্র একটি সার্বজনীন শাসনব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশেও স্বাধীনতার পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ তাদের প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপস্থিতি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখার জন্য সুশাসনের কোন বিকল্প নেই। সুশাসনকে নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিকতা দিতে হবে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন কার্যে অংশ নেয় না। তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নির্বাচকমন্ডলীর দায়িত্ব পালন করে এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে। আর তাই সেই নির্বাচকমন্ডলী বা সাধারণ জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বা চেতনার বহিঃপ্রকাশ কতটুকু আছে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ, এর পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা কতটুকু তৈরী হয়েছে এবং গণসচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় প্রচার মাধ্যম গুলো কি ধরণের ভূমিকা রেখেছে বা রাখছে তা পর্যালোচনা করে দেখা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণার বিকাশ ঃ

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এরিস্টটল স্তিতিশীল গণতন্ত্র (Stable Democracy) প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু আচরণ (norms) ও প্রথার (Customs) কথা উলেখ করেছিলেন। আধুনিক কালের অষ্টাদশ শতকে চার্লস দ্বিতীয় লুই এবং মন্টেস্কুকে আধুনিক রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংস্থাপক (founder) হিসেবে দেখা হয়। মন্টেস্কুর The Spirit of Laws গ্রন্থে একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রা, স্বাধীনতা, ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, আচার প্রথা ইত্যাদি আলোচনা হয়েছে। মন্টেস্কুর পথ ধরেই ক্রমে রুশো, স্টায়েল (Stael), বেনজামিন, কনস্টান্ট, কলার্ড, গাইজট এবং টকভিল বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং তারা রাজনৈতিক বিষয়াদির সাথে সংস্কৃতির অভ্যাস, প্রথা, ঐতিহ্য, জনগণের আশা আকাঙ্খাকেও সম্পৃক্ত করেন। ফ্রান্সের তাত্ত্বিকদের পাশাপাশি জার্মান তাত্ত্বিক যেমন-কান্ট, হেগেল, মার্ক্স, ম্যাক্স ওয়েবার প্রমুখও রাজনৈতিক সংস্কৃতি অধ্যয়নে অবদান রেখছেন।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটি (The term "political Culture") সরাসরি ব্যবহৃত হয় ১৯২০ ও ১৯৩০ দশকের মাঝামাঝি।[২] দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্ব দুটি প্রভাব বলয়ে ভাগ হয়ে যায় এবং নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশগুলোতে কার প্রভাব বজায় থাকবে তা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে প্রতিযোগীতা দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে চেয়েছিল। এ সময় নৃবিজ্ঞান ও সমাজতাত্ত্বিকেরা আমেরিকাকে মূল আদর্শিক ধরে মানুষের আচরণ নিয়ে গবেষণা করেন এবং কোন ধরনের আচরণ গণতন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তা নির্ণয় করেন। এসময় জাতীয় চরিত্র, জাতীয় মনোভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহৃত হয়।

অ্যালমন্ড ও পাওয়েল তাদের Comparative Politics : A Developmental Approach (১৯৫০) গ্রন্থে বলেন যে, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্যাটার্ণই রাজনৈতিক সংস্কৃতি।[৩]

অ্যালমন্ড ও ভারবা'র The Civic Culture (১৯৬৩) গ্রন্থে স্থিতিশীল গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ও আচরণগত ভিত্তি নির্ধারণ করা হয়। তারা পাঁচটি জাতির (আমেরিকা, বৃটেন, মেক্সিকো, জার্মানী ও ইটালী) উপর তুলনামূলক গবেষণা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কতিপয় উপাদানকে চিহ্নিত করেন সেগুলোর সমষ্টিকে তারা পৌর সংস্কৃতি (Civic Culture) হিসেবে উলেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬৫ সালে লুসিয়ান পাই এবং সিডনী ভারবা সম্পাদিত Political Culture and Political Development গ্রন্থের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধ্যয়নের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পাই এর মতে, ব্যক্তি তার নিজস্ব ঐতিহাসিক পটভূমিকায় তার নিজস্ব ব্যক্তি সত্ত্বার মধ্যে জনগণ ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি সম্পর্কে যে জ্ঞান ও অনুভূতি অর্জন ও সংগ্রহ করে তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি। [৪]

১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে অনাগ্রহ জন্মে। পরে ১৯৮০ ও ৯০ এর দশকে আবার বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৮১ সালে হানটিংটনের 'American Politics' এবং ১৯৯১ সালে 'The Third wave' গ্রন্থদু'টি প্রকাশিত হয়। তাছাড়া সভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে গণতান্ত্রিক ধারা সচল করতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ বর্তমানে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

৫.২ বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ ঃ পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত দেশগুলোতে শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। আর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানিকীকরণ প্রক্রিয়াটি সমাজের সর্বত্র সমানভাবে বিকশিত হবার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকর করার অনুকূলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ গড়ে উঠেছে, গড়ে উঠেছে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি যা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে মজবুত করেছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এ ধারা একদিনে গড়ে উঠেনি। এটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘ দিনের বিবর্তন ও যুগ-পরিক্রমার ফসল। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তাত্ত্বিকগণ প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন।

বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টি একদিনে গড়ে ওঠেনি। নানা বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধারাবাহিকতা বয়ে চলেছে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধারণা বিশ্লেষণের জন্য আমরা অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনৈতিক যে ধারা প্রবাহিত হয়েছে তা আলোচনা করতে পারি এভাবে-

(ক) বৃটিশ পূর্ব ভারতের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টি

(খ) বৃটিশ ভারতের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টি

(গ) পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক কৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি।

(ক) বৃটিশ পূর্ব ভারতের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টি

প্রাচীনকালে উপমহাদেশের এ অঞ্চলে গণতন্ত্রের ধারণা ও অনুশীলন প্রায় অনুপস্থিত ছিল এবং শাসকেরা "প্রাচ্যীয় স্বৈরতন্ত্র" (Oriental despotism) প্রতিষ্ঠা করেছিল। অবশ্য শাসক শ্রেণীর উপর অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশেষ করে পুরোহিত শ্রেণী কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু সেটাকে গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়না। [৫] বৃটিশদের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন ভারতে রাজাদের মনে করা হত ঈশ্বরের প্রতিনিধি। [৬] রাজ্যপরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল "পরিষদ" নামে পরিচিত রাজার মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর। রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিষদের সদস্য হতেন শুধু যোদ্ধা ও যাজক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ। এর পূর্ববর্তী আমলে বৈদিক যুগে সমাজের আরো ব্যাপকতর সম্প্রদায়ের লোকজন "পরিষদ" এর সদস্য হতে পারতেন এবং ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে এটি ছিল আরো বেশি গণতান্ত্রিক সংগঠন।

"সভা" নামে অপর একটি রাজনৈতিক সংগঠনেরও বিবর্তন ঘটেছিল একইভাবে। শুরুতে রাজনৈতিক কার্যাদি সম্পাদনে অভিজাতদের প্রতিনিধিত্ব থাকলেও মৌর্য যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে এ সভার সদস্যপদ সীমাবদ্ধ হয়ে সমাজের মুষ্টিমেয় অংশের হাতে চলে এলো এবং তা বিবর্তিত হয়ে পরিণত হল একটি রাজনৈতিক পরিষদ বা রাজসভায়। [৭]

তখন গ্রামগুলো কিছুটা স্বাধীন এবং সমগ্র প্রশাসন "ভূক্তি" "মণ্ডল", "বিথি" নামক সর্বনিম্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত ছিল। মুঘল শাসনামলে গ্রামগুলোকে স্বনিয়ন্ত্রিত (little republics) হিসেবে অভিহিত করা হতো।[৮] মুঘল শাসনের শেষ দিকে গ্রামগুলোকে পরগনার সাথে অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং রাজস্ব ও কর প্রশাসনকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মুর্শিদকুলি খাঁ জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি জমিদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার তুলে দেন। ফলে সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং একটি মধ্যসত্ত্বভোগী শ্রেণী গড়ে উঠে। পরবর্তিতে নবাব আলীবর্দী খান এদেশের স্বাধীন শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেও তিনি কোন স্থিতিশীল এবং গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা শাসন ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পতনের মধ্যদিয়ে এদেশে নতুন ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বৃটিশ ভারতের জনগণের রাজনৈতি কৃষ্টি

১৭৫৭ সালের ২৩ জনু পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে আসা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে এদেশের শাসনভার নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। শাসন ব্যবস্থার মূল পদগুলোতে বৃটিশরা এবং অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে ভারতীয়রা নিয়োগ পেতে থাকে। আই সি এস (Indian Civil Service) সহ বিভিন্ন প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। সমাজের সর্বস্তরে রাজনীতিকরণ (Politicization) ঘটে। ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকগণ নিজেদের শাসন ও শোষনের অনুকূলে এক নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি করে যা বাংলার গ্রামগুলোকে প্রভাবিত করে এবং নতুন এক সামন্ত প্রথার বন্ধনজালে (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা ১৭৯৩ সালে) আবদ্ধ হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সমাজ কাঠামোতে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে তা গণতন্ত্রায়ন এবং প্রতিনিধিত্বশীল প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। এর ফলে রাজস্ব ও কর আদায়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর জন্ম হয়; হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ নষ্ট হয়। কারণ উচ্চ বর্গীয় হিন্দুরা মুসলমানদের নিকট হতে জমিদারী ক্রয় করে তাদের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। এছাড়া এ ব্যবস্থার ফলে ভূমির উপর কৃষকদের স্বত্ব বিনষ্ট হয় এবং পোষক আশ্রিত সম্পর্কের (Patron Client relation) সৃষ্টি হয়। এই সামন্ত প্রথার বন্ধন ছিন্ন করার জন্যই ১৮ শতক এবং ১৯ শতকে ভারতব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। [৯]

ধীরে ধীরে বৃটিশদের ভারতীয়দের উপর শোষনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে একদিকে হতাশা এবং অন্যদিকে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে শুরু করে। তাদের মধ্যে প্রতিবাদ করার মানসিকতা গড়ে উঠে এবং শুরু হয় বিভিন্নমুখী আন্দোলন। প্রথম বড় আকারের প্রতিবাদ হিসেবে দেখা দেয় 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' হিসেবে খ্যাত ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহে বৃটিশরা বড় রকমের চাপ অনুভব করে। এর ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হতে বৃটিশ সরকার নিজের হাতে ভারতের শাসন ক্ষমতা তুলে নেয়। এ সময় থেকেই বৃটিশরা অনুভব করতে থাকে যে, ভারতকে স্থায়ীভাবে শাসন করতে হলে নূন্যতম হলেও ভারতীয় জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। আর এ উপলব্ধি থেকেই বৃটিশ সরকার এ দেশে শাসনের ধরণ পরিবর্তন করতে প্রয়াসী হয়। এ প্রয়াসের প্রথম পদক্ষেপ ছিল ভারতীয় কাউন্সিল এ্যাক্ট ১৮৬১। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ এ্যাক্টকে ভারতীয় সাংবিধানিক ইতিহাসের একটি উলেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। [১০] এ এ্যাক্টের অধীনেই ১৮৬২ সাল থেকে বাংলার আইনসভা যাত্রা শুরু করেছিল। পরবর্তীতে ১৮৯২ , ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের আইনের মধ্যদিয়ে এদেশে একটি সাংবিধানিক রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক ধারা সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, ভারতীয়দের দাবির প্রেক্ষিতে বৃটিশরা বিভিন্ন সময়ে উপরোক্ত আইন ভারতীয়দের কিছুটা সন্তুষ্ট রাখার জন্য প্রবর্তন করলেও এদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর কোন ইচ্ছাই বৃটিশদের ছিলনা। অবশ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে ধরনের সামাজিক ব্যবস্থা, জনগণ, রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতির দরকার ছিল তা ঐ সময়ে ভারতে কতটুকু বিদ্যমান ছিল সেটি একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। এ ক্ষেত্রে বৃটিশদের যুক্তি ছিল যে, ভারতীয়দের হাতে শাসন ব্যবস্থা ছেড়ে দেয়ার উপযুক্ত সময় তখনো হয়নি। কারণ, তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় নেতৃত্বের মধ্যে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজের যে "আদর্শ" এবং "সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ "গুলো অনুপ্রবেশ করেছিল সে অনুপাতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলো ছিল অবিকশিত। এছাড়া, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছিল। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, বৃটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলমান যে সংঘাত তাও বৃটিশদের সৃষ্টি এবং তা ছিল "ভাগ করো এবং শাসন করো নীতির (Divide and rule policy) ফল। [১১]

অন্যদিকে বৃটিশদের বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে রেললাইন স্থাপনের ফলে গ্রামীণ সমাজের সাথে শহরের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হলে গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় রাজনীতির কিছুটা অনুপ্রবেশ ঘটে এবং প্রশাসনিক কাঠামোতেও কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তৃণমূল পর্যায় থেকে জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রের বিকাশের লক্ষ্যে বৃটিশরা Local Bodies সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রথম পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় ১৮৭০ সালের চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইনের (The Village Choukidari Punchayet Act of ১৮৭০) মাধ্যমে এই আইন অনুযায়ী গ্রাম পর্যায়ে "পঞ্চায়েত" গঠন করা হয় যেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (District Magistrate) কতিপয় গ্রাম নিয়ে গঠিত এলাকার জন্য ৫ সদস্যের এই চৌকিদারী পঞ্চায়েত মনোনীত করতেন। গ্রামীণ উন্নয়নের ভার ছেড়ে দেয়া হয় পঞ্চায়েতের উপর। কিন্তু স্থানীয় জমিদারদের প্রভাব এবং পঞ্চায়েত সদস্যগণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীতি হবার কারণে গ্রাম পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা সম্ভব হয়নি যা গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশকে ব্যাহত করেছে। এরপর ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন (The Bengal Local self Government Act of ১৮৮৫) নামে একটি আইন বেঙ্গল কাউন্সিলে পাশ হয়। এ আইনের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রশাসনিক কাঠামোকে ৩টি স্তরে সম্প্রসারণ করা হয়।

১. জেলা পর্যায়ে জেলা বোর্ড;
২. মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড
৩. ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি

এ আইনের মাধ্যমে ১০ থেকে ১৫ বর্গমাইল এলাকার জন্য ৫ জন থেকে ৯ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দু'বছরের জন্য গ্রামীণ পর্যায়ে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় প্রশাসন গড়ে তোলার কথা বলা হলেও প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল জেলা বোর্ডের হাতে। যার ফলে গ্রামীণ পর্যায়ে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ অবরুদ্ধই থেকে যায়। এর

Dhaka University Institutional Repository

পর ১৯০৯ সালের মর্লি মিন্টো সংস্কার আইন এবং ১৯১৯ Bengal Village self Government Act নামক আইন দ্বারা স্থানীয় পর্যায়ে কিছু কিছু দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। এতেও মনোনয়ন প্রথা বহাল থাকে। ফলে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায় থেকেই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। এক পর্যায়ে ১৯৪৬ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন মনোনয়ন প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়। অবশেষে ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়।

(গ) পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক কৃষ্টি ঃ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামক দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানের দু'টি অংশ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে বিভক্ত ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পাকিস্তানের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়নের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে বৃটিশ মডেলে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের কথা বলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তিনি বলেন, "The new state would be a modern democratic state ,with sovereignty resting in the people and the members of the new nation having equal rights of citizenship regardless of their religion, caste or creed. "[১২] কিন্তু নতুন দেশটিকে একটি সংবিধান পেতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘ নয় বছর যা অবশেষে ১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধান পাকিস্তানের জন্য সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেও তা ছিল মূলতঃ একটি আপোষমূলক দলিল যা বিদ্যমান সংকট সমাধান করে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। এ সময়ে পাকিস্তানী রাষ্ট্র কাঠামোতে সবচেয়ে বড় সংকট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক এলিটদের (rulling elite)সাথে বাঙ্গালীদের দ্বন্দ্ব। কারণ, একমাত্র ধর্মছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানী ও বাঙালীদের মধ্যে পৃথক সাংস্কৃতির বিনির্মাণ গড়ে উঠেছিল। যার ফলে পাকিস্তানী রাজনীতির প্রথম দশকেই দুই অংশের মধ্যে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া এবং ক্ষমতা ভাগাভাগি প্রশ্নে বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। এ বিভক্তি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। কারণ, ভাষাগত দিক থেকে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৫ ভাগের ভাষা ছিল বাংলা এবং মাত্র ৭.২ ভাগের ভাষা ছিল উর্দু। [১৩] তা সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়া হলে আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় এক প্রকার ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ (Linguistic nationalism) গড়ে উঠে। এই ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের গ্রামভিত্তিক স্বদেশীয় এলিটদের (rural based vernacular elite) জন্ম হয় যারা ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শবাদে একত্রিত হয় এবং ফলশ্রুতিতে গড়ে উঠে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রতি জনগণ সমর্থন প্রদান করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ৩০৯ টি আসনের মধ্যে ২৩৩টি এবং ক্ষমতাশীল মুসলিমলীগ ১০টি আসন লাভ করে। এ পর্যায়ে গণতন্ত্র নির্মাণের একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও ইতোমধ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় চরম অস্থিতিশীলতা বিরাজ করতে থাকে। ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ১২ জন প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল যা চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকেই প্রমাণ করে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সামরিক বেসামরিক আমলাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এমনকি জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী খানের মতো যোগ্য নেতারাও এর উর্ধে ছিলেন না। এমতবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষভাবে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই সাথে পাকিস্তানের সব ধরনের সাংবিধানিক রাজনীতির অবসান ঘটে।

১৯৬২ সালে আইয়ুব খান যে সংবিধান প্রণয়ন করেন তাতে গণতন্ত্রের পরিবর্তে তার নিজের ক্ষমতাকেই সাংবিধানিক রূপ দেয়। এ সংবিধান রাষ্ট্রপতির স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এর আগে ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ (Basic Democracy Order) অনুসারে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে একটি নতুন ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে গ্রামগুলোকে সরাসরি জাতীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ জারির পর আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে গণতন্ত্র জনগণের দোড় গোড়ায় পৌঁছে দেয়া হবে এবং এর দ্বারা গ্রামকে রাজধানীর সাথে সংযুক্ত করা যাবে। মৌলিক গণতন্ত্রের বদৌলতে ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠে। মৌলিক গণতন্ত্র বহুবিধ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করা হয়, তার মধ্যে উন্নয়ন কর্মকান্ডে গ্রামীণ জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ছিল অন্যতম দুটি উদ্দেশ্য।[১৫] এ ব্যবস্থায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হতে ৪০,০০০ করে মোট ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হত। এরাই আইনসভার সদস্য ও রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করতে পারত। এর ফলে গ্রামীণ পর্যায়ের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত রাজনীতি প্রবেশ করে বটে কিন্তু গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়নি। কারণ এ ব্যবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্রীগণ বিশেষ করে সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকজন নানাবিধ সুবিধা প্রাপ্তির আশায় সরকারকে সমর্থন করে যার মাধ্যমে আইয়ুব খান তার ক্ষমতাকে বৈধকরণের চেষ্টা করেন। তাছাড়া এটি ছিল অতিমাত্রায় আমলা নির্ভর শাসন ব্যবস্থা। সমাজের সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। সুতরাং বলা যায়, মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে গণতন্ত্র গড়ে তোলার কথা বলা হলেও তা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে এবং ব্যাপক সমালোচনার কারণে এ ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারেনি।[১৬]

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবর রহমান ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা করলে আন্দোলন বেগবান হতে থাকে। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ ৬-দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আন্দোলন চালাতে থাকে। ১৯৬৮ সালের

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র আন্দোলন এবং ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্ত র করেন। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা লাভের পর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলেন এবং আইনগত কাঠামো আদেশ (Legal Framework order) জারি করেন। এই আইনগত কাঠামো আদেশের অধীনে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ । শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে। উপরন্ত, বাঙ্গালীদের দমন করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নৃশংস গণহত্যা চালায়। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানী শাসনকাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, পুরো পাকিস্তান আমলে বিভিন্নভাবে গণতন্ত্র নির্মাণের কথা বলা হলেও জনগণকে সেভাবে সম্পৃক্ত করতে পারেনি। ফলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেনি। একজন গবেষকের ভাষায়-

"Unfortunately the Pakistan state did not conform to democratic ideales and the Pakistani leaders failed to understand the intensity of the desire of people of east Bengal. Rather the Pakistani rulers underestimated the irresistibility of the Bengalis demand for a democratic system" [১৭]

(ঘ) স্বাধীনতা পরবতী বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টি ঃ

স্বাধীনতার সুফলকে সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌছে দেবার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী কালে শাসক এলিটগণ বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি ধারা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের প্রণীত সংবিধানে সংসদীয় ব্যস্থাকে সরকারের ধরণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রতিযোগীতামূলক দলীয় ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারসহ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূলে বিভিন্ন ব্যবস্থা সংবিধানে গৃহীত হয়। গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রাম পর্যায়ে পৌছে দেয়ার জন্য ১৯৭২ সালের ১৫ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মোজাফফর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গণতন্ত্রীকরণের জন্য সুপারিশ করে। [১৮] উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে 'পঞ্চায়েত' ব্যবস্থার পরিবর্তে ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করে গ্রামীন প্রশাসনিক কাঠামোকে পুর্ণগঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসন লাভ করে। এ সময় গ্রামীণ প্রশাসনিক কাঠামোতে দলীয় প্রভাব পড়তে থাকে। উপরন্ত স্বাধীনতা পরবর্তী সংকট, বিরোধী দল বিশেষভাবে কতিপয় বাম দলের অসহযোগীতা ও সশস্ত্র যুদ্ধ, সরকারের অব্যবস্থাপনা ও ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে গণতন্ত্রায়নের প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এছাড়া ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ কর্তৃক বাকশাল প্রবর্তন গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়াকে সমূলে বিনষ্ট করে। কারণ এর মাধ্যমে একদলীয় ও কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিব সামরিক বাহিনীর কতিপয় জুনিয়র অফিসার কর্তৃক সপরিবারে নিহত হলে ধীরে ধীরে সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতায় সমাসীন হয়।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রকৃত ক্ষমতা তৎকালীন সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমানের হতে চলে যায়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর জিয়াউর রহমান তার সামরিক শাসনকে বৈধকরণের জন্য বেসমরিকীকরণ ও গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া আরম্ভ করেন। [১৯] এ লক্ষ্যে তিনি ২১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং দেশে গণতান্ত্রিক ধারা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। গ্রাম পর্যায়ে ১৯৭৬ সালের ২০ নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ জারি করেন এবং এতে তিন স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় শাসন কাঠামো গড়ে তোলার কথা বলা হয়। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার প্রতি আস্থা আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ৩০ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে তিনি শতকরা ৯৯ ভাগ ভোট পান। প্রথমে স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন, পরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও সবশেষে পার্লামেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে কার্যক্রমের সুযোগ করে দেন। ১৯৮০ সালে 'স্বনির্ভর গ্রাম সরকার' গঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের প্রতিনিধিত্বকে জোরদার করেন। সেখানে ১২ জন সদস্যের মধ্যে দুজন মহিলা সদস্য ছিল। স্বনির্ভর গ্রাম সরকারকে গ্রামীণ উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করলেও তা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তাছাড়া সেই সময়ে ক্ষমতাসীন বি.এন.পি ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল একে সমর্থন করেনি। [২০] সুতরাং দেখা যায় জিয়াউর রহমানের শাসনামলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কিছুটা গণতন্ত্রায়নের ছোঁয়া লাগে বটে কিন্তু জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গুলোতে পুরোপুরি গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়নি। তাছাড়া এ সময়ে গ্রামীণ প্রশাসনিক কাঠামোতে রাজনীতিকরণ ও দলীয়করণ করা হয়। [২১]

১৯৮১ সালের ৩১ মে এক সামরিক অভূথানে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর ঐ বছর তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার শতকরা ৬৫.৫২ ভাগ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৮২ সালের মে মাসে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন এবং সামরিক শাসন জারী করেন। সামরিক সরকারের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী তিনি গণতন্ত্রায়ন ও জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার কথা বললেও কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি অন্যান্য সামরিক সরকারের মত তার শাসনকে বৈধকরণ ও বেসামরিকীকরণ, দলীয় কার্যক্রম আরম্ভ, স্থানীয় শাসন কাঠামো পুনঃবিন্যাস ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ক্ষমতার বৈধকরণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করলেও তা সফল হয়নি। কারণ তার শাসনামলের পুরো নয় বৎসর রাজনৈতিক কাঠামোতে বৈধতা ও

Dhaka University Institutional Repository

ঐকমত্যের সংকট ছিল। ৯ বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নির্বাচনের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য তিনি উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং জনগণের অনুপ্রবেশের সুযোগ ও জবাবদিহিতা না থাকায় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে তার দীর্ঘ নয় বছরের শাসনামলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ পুরোপুরি অবরুদ্ধ ছিল। তিনি ৯ বছর দেশ শাসন করার পর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে তার পতন ঘটে।

বিরোধীদল গুলোর সমঝোতার ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অবাধ ও সুষ্ঠু সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বি.এন.পি সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গণভোট অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। ৯০ পরবর্তী সময় থেকেই মূলতঃ এদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটতে থাকে। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। এ সময় গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়াকে তৃণমূল পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহেরও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯১ সালের ২৩ নভেম্বর একজন মন্ত্রীকে প্রধান করে Local Government Structure Review Commission নামক উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয় একটি স্থানীয় সরকার কাঠামোর সুপারিশ করার জন্য যাতে গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৯৩ সালে জাতীয় সংসদে ইউনিয়ন পরিষদ বিল পাস হয়। এতে একটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে প্রতি ওয়ার্ড থেকে একজন করে সদস্য ও সমগ্র ইউনিয়নের জন্য একজন চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের পূর্বের কার্যক্রমই বহাল থাকে। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে আন্দোলন করতে থাকে এবং বছরের শেষের দিকে বিরোধী দলগুলো একযোগে সংসদ বর্জন করতে থাকলে জাতীয় রাজনীতিতে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়। কিন্তু বি.এন.পি সরকার এই তীব্র আন্দোলনকে সামনে রেখেই সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বিরোধী দলগুলোর অংশ গ্রহণ ছাড়াই ১৯৯৫ সালের ১৫ ফেব্রয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। অবশেষে বিএনপি সরকার ২৭ মার্চ সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করে এবং পদত্যাগ করে। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। এ নির্বাচনেও জনগণের ব্যাপক অংশ গ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। আওয়ামী লীগ সরকারও ক্ষমতায় এসে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে চারস্তর বিশিষ্ট সরকার গঠনের কথা বলেন। ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই

Dhaka University Institutional Repository

সাথে ১৯৯৮ সালের জুলাই মাসে উপজেলা বিল পাশ হয়। ১৯৯৯ সালের মে ও পরে ডিসেম্বরে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। এতোমধ্যে বিএনপি সহ বিরোধীদলগুলো বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন করতে থাকে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশ শাসনের পূর্ণ মেয়াদ শেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ২০০১ সালের ১৫ জুলাই বিচারপতি লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দলীয় ঐক্যজোট মোট ২১৪টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে।

৫.৩.গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ ঃ

অ্যালমন্ড ও ভারবার মতে Unless the Political culture is able to support a democratic system, the chances for the success of that system are slim. [২২]

এখানে প্রাপ্ত তথ্য গুলোর ভিত্তিতে গ্রামীণ মানুষের রাজনৈতিক বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গী, সচেতনতা, মতামত, সম্পৃক্ততা ও আস্থা-এই পাঁচটি স্বতন্ত্র উপাদানে ব্যক্তির অবস্থান কোথায়, এদের সমন্বয়ে তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরণ দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটা নম্বর প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ, মধ্যম, নিম্ন ইত্যাদি অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সর্বোচ্চ নম্বর ১৫ এবং সর্বনিম্ন শূন্য। এগুলোর বিন্যাস দেখানের হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৫.১ ঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরণ

স্কোর	রাজনৈতিক সংস্কৃতি	পুরুষ		মহিলা	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
১২-১৫	উচ্চ	১৬০	২৬.৬৭	১০	১৬.৬৭
৭-১১	মধ্যম	৩৬০	৬০.০০	১৫	২৫.০০
১-৬	নিম্ন	৮০	১৩.৩৩	৩৫	৫৮.৩৩
০-০	শূন্য	--	--	--	--
		৬০০	১০০	১২০	১০০

উপরোক্ত টেবিল হতে দেখা যায়, পুরুষদের মধ্যে ২৬.৬৭ এর রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাত্রা উচ্চ, ৬০% ভাগের মধ্যম প্রকৃতির এবং ১৩.৩৩% নিম্ন প্রকৃতির। মহিলাদের মধ্যে এই মাত্রা আরও হতাশাব্যাঞ্জক। যেমন মাত্র ১৬.৬৭% মহিলার রজানৈতিক সংস্কৃতি উচ্চ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত এবং ২৫% মধ্যম প্রকৃতির ও ৫৮.৩৩% নিম্ন সংস্কৃতির। উপরের চিত্র হতে নারী ও পুরুষের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরণ আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে।

৫.২.টেবিল-২ ঝাওয়াইল ইউনিয়নের নারী-পুরুষের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ ঃ

চলক সমূহের প্রাপ্ত স্কোর		যোগাযোগের সুবিধা	সচেতনতা	মতামত	সম্পৃক্ততা	আস্থা
পুরুষ	উচ্চ	৪৮%	১০%	৩৭%	২৪%	১৯%
	মধ্যম	৪২%	৫০%	৪১%	৩৮%	৬১%
	নিম্ন	৭%	৩৬%	২২%	২৫%	২০%
	শূন্য	৩%	৪%	---	১৩%	--
নারী	উচ্চ	২০%	৬%	১২%	--	৬%
	মধ্যম	২৬%	৮%	৩৮%	১০%	৩২%
	নিম্ন	৩৫%	৮৪%	৫০%	৩০%	৫৪%
	শূন্য	১৯%	২%	---	৬০%	৮%

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত চিত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষদের মধ্যে বাইরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা বা যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাথে সম্পর্ক রয়েছে বেশী এবং তাদের মধ্যে সচেতনতার হার সবচেয়ে কম। অর্থাৎ, তারা যে হারে বাইরের সাথে যুক্ত সে হারে সচেতন নয়। চলক সমূহকে যদি মাত্রা অনুসারে সাজানো যায় তাহলে প্রথমেই আসে যোগাযোগ সুবিধা, দ্বিতীয়ত মতামত, তৃতীয়তে সম্পৃক্ততা, চতুর্থতে আস্থা এবং সবশেষে সচেতনতা। তারা মতামত ব্যক্ত করতেও বেশ এগিয়ে রয়েছে।

অন্যদিকে মহিলাদের অংশে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের সর্বোচ্চ স্কোর রয়েছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এবং সর্বনিম্ন রয়েছে সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে। এখানে ধারাবাহিকভাবে উপাদানগুলো সাজালে এভাবে আসেঃ যোগাযোগ সুবিধা, মতামত, আস্থা, সচেতনতা এবং সবশেষে সম্পৃক্ততা। গ্রাম পর্যায়ে রাজনৈতিক বিষয়ে মহিলাদের জ্ঞান এবং অংশ গ্রহণ অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। তারা বাইরের বিশ্বের সাথে (গৃহের বাইরে) যোগাযোগ রক্ষা করেনা বলে তাদের কাছে রাজনৈতিক তথ্যসমূহও পৌঁছায় না। এছাড়া অশিক্ষা, বিচ্ছিন্নতা, সমাজে তাদের অধস্তনতা ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদেরকে রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে না। গ্রামের অধিকাংশ মহিলাই মনে করে রাজনৈতিক বিষয় তাদের ক্ষেত্র নয়।

পুরুষ ও মহিলাদের রাজনৈতিক কৃষ্টির নির্ধারক সমূহ ঃ

পুরুষদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে যে বিষয় গুলো সম্পর্ক যুক্ত সেগুলো হলো ঃ বয়স, শিক্ষা, আয়, ভূমির পরিমাণ, পেশা, ইত্যাদি। আবার মহিলাদের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত কতিপয় বিষয় রয়েছে। যেমন-তার শিক্ষা, আর্থসামাজিক অবস্থা, পরিবারের আয়, জমির পরিমাণ, সে শুধুই গৃহেই থাকছে না বাইরেও কাজ করছে, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে যুক্ত কিনা এবং সর্বোপরি তার পরিবারের প্রধানের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ইত্যাদি।

(১) শিক্ষার সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক ঃ

শিক্ষার সাথে গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একজন ব্যক্তি যখন শিক্ষিত হয় তখন সে অনেক বিষয়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কেও জানতে পারে যা কিনা সরাসরি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। সাধারণতঃ একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির স্বাভাবিক ভাবেই আয় বেশী হয়, মান সম্মান বেশী

Dhaka University Institutional Repository

থাকে-এগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাবক। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অশিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী রাজনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানতে পারে।

সারণী ঃ ৫.৩ শিক্ষার সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক

শিক্ষা	উচ্চ	মধ্যম	নিম্ন	মোট
নিরক্ষর	১০	১৫০	২০	১৭০
প্রাইমারী	২০	৯০	৪৫	১৬৫
নিম্ন মাধ্যমিক	৩৫	১০৫	৫০	১৯০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১০০	৫০	৫	১৫৫
স্নাতক+	৩৫	৫	০	৪০
মোট	২০০	৪০০	১২০	৭২০

সারনীর ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, যারা যত বেশী শিক্ষিত তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তত উচ্চ, যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে ১০ জন (৫%), প্রাইমারী পর্যন্ত যারা লেখা পড়া করেছে তাদের মধ্যে ২০ জন (১০%), নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখা পড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৩৫ জন (১৮.৪২%), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছে তাদের মধ্যে ১০০ জন (৬৪.৫২%) এবং স্নাতক বা তার উর্ধ্বে যারা লেখাপড়া করেছে তাদের মধ্যে ৩৫জন (৮৭.৫০%) উত্তরদাতা উচ্চ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধিকারী। অন্যদিকে যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে ১৫০ জন(৩৭.৫%), যারা প্রাইমারী পড়েছে তাদের মধ্যে ৯০জন(২২.৫ %) ,যারা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে তাদের মধ্যে ১০৫জন (৩৭.৫%) এবং যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে তাদের মধ্যে ৫০জন(১২.৫ %) উত্তরদাতার মধ্যম রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধিকারী। আর যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে ২০জন (১৬.৬ %), যারা প্রাইমারী পর্যন্ত লেখা পড়া করেছে তাদের মধ্যে ৪৫জন (৩৭.৫ %), যারা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে তাদের মধ্যে ৫০জন (৪১.৬ %) এবং যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে তাদের মধ্যে ৫জন(৪.১৬%) নিম্ন সংস্কৃতির অধিকারী ।

Dhaka University Institutional Repository

(২) আয় ও পেশার সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক ঃ

ব্যক্তির রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আয়ও একটি অন্যতম উপাদান। কেননা, আয়ের ভিন্নতার কারণে তথ্য প্রাপ্তির, শিক্ষার, পেশার ইত্যাদিরও তারতম্য দেখা যায়। এছাড়া আয়ের সাথে গ্রামে মান-মর্যাদাও নির্ভরশীল। যাদের আয় বেশী গ্রামীণ রাজনীতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় তাদেরই দেখা যায়। আবার রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সম্পর্ক থাকায় তারা রাজনৈতিক বিষয়েও সচেতন ও অংশগ্রহণ বেশী করে। অন্যদিকে কম আয়ের লোকদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়েও আগ্রহ কম দেখা যায়। এর পেছনে অবশ্য তাদের রাজনীতির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও দায়ী।

আবার মহিলাদের বেলায় দেখা যায়, উচ্চ আয়ের পরিবারের মহিলাদের কাছে রাজনৈতিক তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যম গুলো সহজতর। এসব পরিবারের পুরুষেরা নেতা বা গ্রামীণ রাজনীতিতে প্রভাব বজায় রাখে। ফলে এসব পরিবারের মহিলাদের সচেতনতাও বেশী থাকে। আবার যে সমস্ত মহিলারা কাজের জন্য বাইরে যায় তারাও তুলনামূলক ভাবে অন্যদের চেয়ে বেশী সচেতন হয়। উচ্চ আয়ের পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার হারও বেশী দেখা যায়। তবে নিম্ন শ্রেণীর মহিলাদের বাইরে যাতায়াতে নিষেধ থাকায় (কারণ, স্বামীর পরিবারে আয়ের জন্য হয়তো তাকেও কাজ করতে হয়) তাদের মধ্যেও রাজনৈতিক জ্ঞান বা কার্যক্রম বেশ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে মধ্যম প্রকৃতির আয়ের পরিবারের মেয়েরা কম সচেতন। তাদের ওপর পারিবারিক ও সামাজিক বাধা বেশী থাকে। এ ধরনের পরিবারে পর্দা প্রথা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হয়। আবার পরিবারে আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে তাকে সারাদিন গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ভাববার সময় তাদের কম থাকে। আবার উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মহিলাদের যে অধিক হারে রাজনৈতিক জ্ঞান গড়ে ওঠে তাও পক্ষপাতমূলক। পরিবারের পুরুষদের মতামতের প্রভাবই তাদের মতামতের উপর প্রভাব ফেলতে দেখা যায়। অর্থাত পুরুষদের পছন্দ মতই তারাও অনুরূপ পছন্দ করে থাকে।

(৩) ভূমির সাথে রাজনৈতিক কৃষ্টির সম্পর্ক ঃ

ভূমি মান-মর্যাদার একটি মাধ্যম হলেও গ্রামীণ জনগণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে তেমন প্রভাব ফেলে না। কারণ সনাতন পদ্ধতিতে চাষ করার ফলে ভূমি এখন আর লাভজনক নয়। বরং যারা আধুনিক পেশার (চাকুরী-ব্যবসা) প্রভৃতির সাথে যুক্ত তাদের আয়ই বেশী। আয় এবং চাকুরীর পেশা গ্রামীণ এলাকায় বেশ প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এছাড়াও এ ধরনের লোকজন বাইরের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ফলে দেশ ও রাজনীতি সম্পর্কে জানা এবং মতামতেরও সুযোগ বেশী পায়। আবার ভূমির বিষয়টি মহিলাদের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব না ফেললেও পরোক্ষভাবে তা প্রভাব ফেলে। পরিবারে ভূমি বেশী থাকলে প্রভাব প্রতিপত্তিও বেশী থাকে। আর এ কারণে এসব পরিবারের মহিলারাও অন্যদের চেয়ে রাজনৈতিক ব্যাপারে এগিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ শ্রেণী = ১২ বিঘা +

মধ্যবিত্ত = ৬-১২ বিঘা

নিম্ন বিত্ত = ১-৬ বিঘা

ভূমিহীন = যাদের চাষের জমি নেই

দেখা যায় যে, অধিক আয়ের লোকরাই উচ্চ বিত্ত আর তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও মধ্যবিত্ত, নিম্ন বিত্ত এবং ভূমিহীনদের চেয়ে অনেক উচ্চ।

৫.৪ সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতণতার সমস্যা ও সম্ভাবনা

সচেতনতা ঃ সচেতনতা হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং অবগত হওয়া এবং প্রতিনিয়ত সচেতনতার মাত্রা পরিবর্তিত হওয়া। Dictioary of Philosophy তে সচেতনতা হলো ঃ "Consciousness is the sum total of mental processes which actively participate in man's understanding of the objective world and of his personal being. [২৩] A Dictionary of the social science এ সচেতনতা বলতে চারটি বিষয়ে অবগত হওয়াকে বোঝায় ঃ ১। নিজের মানসিক ও শারীরিক কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত হওয়া; ২। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া; ৩। পৃথক ব্যক্তি সত্ত্বা হিসেবে নিজের সম্পর্কে ধারণা; ৪। একটি গ্রুপের সদস্য হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করা। [২৪]

সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ঃ

রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে যদি জাতীয় রাজনীতির অনুশীলন ধরা হয় তাহলে সচেতনতা হলো এই অনুশীলন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বা জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology or theory of knowledge)। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও সচেতনতা হলো মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ ।ব্যক্তির নাগরিক সচেতনতা হলো রাজনীতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা। বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী নীতি ঃ রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য সরকার জনজীবনকে ঘিরে কিছু নীতি প্রণয়ন করে। ঝাওয়াইল ইউনিয়নের জনগণকে এসব নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তারা এগুলো সম্পর্কে কতটুকু খোঁজ রাখে তা জানার জন্য তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল।

সারণী-৫.৪ ঃ

নং	প্রশ্ন	উত্তর	স্কোর	উত্তরদাতা	
				ঈুরুষ	মহিলা
১।	সরকারী নিয়মনীতি সম্পর্কে খোঁজ রাখেন কি?	নিয়মিত	৩	১৮০	১২
		কখনও কখনও	২	৪২০	১৮০
		হ্যা	০		
২।	আপনি আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন কি?	নিয়মিত	৩	৮৪	--
		কখনও কখনও	২	২২৮	১৭
		হ্যা	০	২৮৮	১০৩
৩।	জাতীয় রাজনীতির খোঁজ নেন কি?	নিয়মিত	২	৯৬	১০
		কখনও কখনও	১	২২৮	১৯
		হ্যা	০	২৭৬	৯১
৪।	কিছু জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে বলেন।	পারে	৩	৩২০	২৪
		পারে না	০	২৮০	৯৬
৫।	কিছু স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে বলেন।	পারে	৩	৪০৬	১৮
		পারে না	০	১৯৪	১০২
৬।	অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জানেন?	পারে	৩	৩৩০	১২
		পারে না	০	২৭০	১০৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, গ্রামগুলোর বেশির ভাগ লোকই (৬০০ জনের মধ্যে ৪২০ জন) বলেছে তারা সরকারী নিয়ম-নীতি সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। কেবল কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিরাই খবরের কাগজ পড়ার বা রেডিও টেলিভিশন দেখার এবং ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবরা কর্মস্থলের কারণে কিছুটা সচেতন হন। তাও এদের মধ্যে অনেকে নিয়মিত খোঁজ রাখেন না। অধিকাংশ মত প্রকাশ করেন যে, "সরকারের কাজ নীতি প্রণয়ন করা এবং জনগণের কাজ তা মেনে চলা। সরকার কি ধরণের নীতি গ্রহণ করবে তা তারই বিষয়। এত বড় খবরে আমাদের কি প্রয়োজন? সরকার যা প্রয়োজন মনে করবে তা করবেই, আমাদের ক্ষমতা নেই তা বদলে ফেলি।"

মহিলাদের মধ্যে এই সচেতনতার মাত্রা আরও কম। ১২০ জনের মধ্যে ১০৮ জনই জানিয়েছেন তারা সরকারী নীতিসমূহ সম্পর্কে খোঁজ রাখেন না এবং নাগরিক কি বোঝেন না। তাদের সাধারণ উত্তর ছিল "আমরা ঘর সংসার নিয়েই ব্যস্ত-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কি হচ্ছে তা আমাদের জানার দরকার নেই। অত বড় বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই, বুঝিওনা। সরকারের কাজ সরকার করুক, আমাদের কাজ আমরা।"

যেদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং তারা সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন না, নাগরিক কি, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি তা জানেনা সে দেশে কল্যাণমূলক নীতি কতটা প্রণীত হবে তা বিবেচ্য বিষয়। খোঁজ খবর না নেয়ার কারণে কল্যাণকর নীতির চাহিদা যেমন আসছে না তেমনি অকল্যাণকর নীতির প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া তারা দেখাতে পারছেন না।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সচেতনতা ঃ

যোগাযোগ ব্যবস্থা এখন এতটাই উন্নত হয়েছে যে, বিশ্ব এখন ব্যক্তির দারপ্রান্তে এসে পৌছেছে। তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে ঘরে বসেই সারা বিশ্ব সম্পর্কে সব জানা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু গ্রামীণ জনগণ এ সম্পর্কে কতটা সচেতন তা জানার জন্য তাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল "আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন কি?

সারণী-১

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সচেতনতা				
লিঙ্গ	হ্যাঁ	কিছু কিছু	না	মোট
মহিলা	৭	১২	১০১	১২০
পুরুষ	৭২	১৪৮	৩৮০	৬০০
মোট	৭৯	১৬০	৪৮১	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায়, গ্রামের মানুষ আন্তর্জাতিক বিষয়ে খোঁজ-খবর আরও কম রাখেন। সুযোগ-সুবিধা ও সামর্থের অভাব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সমূহের অধিকাংশই শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এ বিষয়ে তাদের আগ্রহ কম।

এ বিষয়ে মহিলাদের সচেতনতার হার আরও কম। দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে তারা এলাকার খোঁজ-খবরই রাখেন না আর আন্তর্জাতিক খবর তো দূরের কথা।

জাতীয় রাজনীতিতে সচেতনতা ঃ

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জনগণের কাছে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বৈধতা অর্জিত হয়। সাধারণ নাগরিকের রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ততা অনেকাংশের কেবল ভোটের মাধ্যমে। আর এই ভূমিকা পালনের জন্য তারা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব প্রেরণকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

"জাতীয় রাজনীতির খোঁজ নেন কি?"

সারণী-৫.৫

	জাতীয় রাজনীতিতে সচেতনতা			
লিঙ্গ	হ্যাঁ	কিছু কিছু	না	মোট
পুরুষ	৩৭০	১৯০	৪০	৬০০
মহিলা	২১	৩৯	৬০	১২০
মোট	৩৯১	২২৯	১০০	৭২০

এ প্রশ্নের জবাবে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় অধিকাংশ পুরুষ ও মহিলা উত্তরদাতা বিশ্বাস করেন যে, নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষা করা সম্ভব। এদের অধিকাংশই অভিযোগ করে বলেন যে, "প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থে ও দলের স্বার্থ রক্ষা করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।" আবার অনেকে বলেন, "দলের স্বার্থ রক্ষা করা না হলে দল টিকবেনা।" অনেকেই আত্মীয় স্বজনদের সুবিধা দেয়ার মত দলের লোকদের সুবিধা দেয়াকে অন্যায় মনে করেন না।

তুলনামূলকভাবে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে "জানিনা" 'বুঝিনা' এ ধরনের উত্তর বেশী। রাজনীতির সকল বিষয়েই তাদের মধ্যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে। এর কারণ পরিবারেই তারা তাদের অধিকার ভোগ ও ন্যায্য পাওনা পাচ্ছে না। জাতীয় রাজনীতিবিদগণ কর্তৃক নির্বাচনী ওয়াদা রক্ষার জন্য তাদের সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে এটি তারা চিন্তাই করতে পারেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ সচেতনতার ব্যাপ্তি ঃ

(১) জাতীয় বিষয়ের সমস্যা ঃ উন্নয়নশীল দেশের নানা ধরনের সমস্যা স্থিতিশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হয়ে দাড়ায়। জনগণ যদি এই সব সমস্যা সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং নিরসনের জন্য সচেষ্ট হয় তাহলে তা নিরসনের পথ সুগম হয়। এর জন্য প্রথমেই যা দরকার তা হলো এই সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা। গ্রামের মানুষের মধ্যে জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট চেতনা রয়েছে কিনা তা জানার জন্য তাদের জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে বলতে বলা হয়েছিল।

সারণী-৫.৬

জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা				
লিঙ্গ	হ্যাঁ	মোটামুটি	না	মোট
পুরুষ	৩৩০	২১৫	৫৫	৬০০
মহিলা	৩১	৩৯	৫০	১২০
মোট	৩৬১	২৫৪	১০৫	৭২০

পুরুষের মধ্যে ৫৫% লোক জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে বলতে পেরেছে। তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব ইত্যাদিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। শিক্ষিতরা গুছিয়ে বলতে পারলেও অশিক্ষিতেরা কাজের অভাব, খাদ্যের অভাবের কথা বলেছে। আবার কেউ কেউ কৃষি সমস্যা যেমন ঃ সার, পানি, কীটনাশক সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা বলেছেন। অনেকে সন্ত্রাস, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।মহিলাদের মধ্যে ২৬% জাতীয় সমস্যার কথা বলতে পেরেছেন। অনেকেই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ইত্যাদিকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দারিদ্রতা ইত্যাদিকেও তারা জাতীয় সমস্যা বলে মনে করেন।

(২) স্থানীয় সমস্যাঃ ব্যক্তির সচেতনতার বিষয়টি যাচাই করার জন্য প্রথমেই দেখা দরকার সে তার আশে পাশের পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখে কিনা। স্থানীয় এলাকার সমস্যা সম্পর্কে ব্যক্তি বলতে পারে কিনা তার মাধ্যমেও ব্যক্তির সচেতনতার মাত্রা যাচাই করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.৭

স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা				
লিঙ্গ	হ্যাঁ	মোটামুটি	না	মোট
পুরুষ	৪৯৭	৯৮	৫	৬০০
মহিলা	৮৪	২৮	৮	১২০
মোট	৫৮১	১২৬	১৩	৭২০

যে সব স্থানীয় সমস্যার কথা তারা বলেছেন তার মধ্যে রাস্তা ঘাটের সমস্যাই প্রধান। এছাড়া বিদ্যুৎ না থাকা, এলাকার দলাদলি এবং বেশির ভাগই ব্যক্তিগত সমস্যার কথা তারা তুলে ধরেন। এছাড়া স্কুল কলেজ গুলোতে ঠিকভাবে পড়াশুনা হয়না বলে তারা জানান, আর মহিলারা নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যা গুলোকেই তুলে ধরেন। অনেক সমস্যা ভোগ করলেও সব বলতে পারেন না।

(৩) অধিকার ও কর্তব্য ঃ দেশের প্রতি প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য এবং কিছু অধিকার রয়েছে। একমাত্র সচেতন নাগরিকই রাষ্ট্রের প্রতি তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। তাদের কি কি অধিকার রয়েছে এবং কি কি কর্তব্য রয়েছে তা তারা জানে কি না? এ প্রশ্নের জবাবে-

সারণী-৫.৮- অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা

লিঙ্গ	হ্যাঁ	মোটামুটি	না	মোট
পুরুষ	৫৪২	৪৬	১২	৬০০
মহিলা	১১	১৫	৯৪	১২০
মোট	৫৫৩	৬১	১০৬	৭২০

পুরুষদের মধ্যে এ প্রশ্নটির বেশ ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। তাদের অধিকাংশই দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কতৃব্য এবং ভূমিকার কথা স্বীকার করেছে। আবার অনেকেই তাদের কি কি কর্তব্য, অধিকার এবং কি করার সুযোগ রয়েছে তা তারা জানে না। তবে তারা সবাই জোড় দিয়ে বলেছে দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য রয়েছে। জবাবের মধ্যে বেশ দৃঢ়তার ছাপ দেখে তাদের সচেতনতা বোঝা যায়। যারা দৃঢ় ভাবে সমর্থন করেছে তারা একটু মাতবর ধরনের,

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষিত বা কোন না কোন দলীয় সমর্থক, আবার অনেকেই পারিবারিকভাবে স্বচ্ছল। কারণ, অধিকাংশ দরিদ্র উত্তরদাতাই বলেছেন, "আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, পেটের চিন্তায়ই দিন যায়, দেশের কথা কি ভাববো?

মহিলাদের অধিকাংশই বলেছে, তারা বিষয়টি জানেনা , বোঝে না। আবার অনেকেই না বুঝে বলেছে, 'হ্যা আছেই তো' কিন্তু কি ধরনের দায়িত্ব কর্তব্য ও অধিকার রয়েছে তা তারা বলতে পারেনি।

(৪) রাজনৈতিক সচেতনতা ঃ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সরকার ও রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াই হল রাজনৈতিক সচেতনতা। রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তির খোঁজ খবর রাখার ওপরই তার রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা নির্ভরশীল। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সচেতনতা সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। গ্রামীণজনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা পরিমাপের ক্ষেত্রে যে বিষয় গুলোর উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপক করা হয়েছে সে বিষয়গুলো হলো ঃ

১। সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা

২। সরকারী নীতি বা কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা

৩। বিরোধীদলের কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা

১.সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা : বর্তমানে বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে গ্রমীণ জনগন সচেতন কিনা তা জানার জন্য গবেষনা এলাকার উত্তরদাতাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কি জানেন বর্তমানে বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা চালু আছে?

সারণী-৫.৯ সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা

লিঙ্গ	হ্যাঁ	মোটামুটি	না	মোট
পুরুষ	৫৪২	৪৬	১২	৬০০
মহিলা	১১	১৫	৯৪	১২০
মোট	৫৫৩	৬১	১০৬	৭২০

সারনী বিশ্লেষনে দেখা যায়, ৫৫৩ জন (৭৬.৮০%) উত্তরদাতা সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন, ৬১ জন (৮.৪৭%) মোটামুটি সচেতন এবং ১০৬জন (১৪.৭২%) উত্তরদাতা সচেতন নয়। লক্ষ্যণীয় যে, জনগণ বর্তমান সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ সচেতন।

Dhaka University Institutional Repository

২. সরকারী নীতি বা কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা ঃ জনগণের জন্য সরকার যে ধরনের নীতি গ্রহণ করে তা বাস্ত -বায়নের পদ্ধতি কি, তা জনগণের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কিনা এ বিষয় গুলো সম্পর্কে জনগণ সচেতন কি না তা জানার জন্য তাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কি সরকারের বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন?

সারণী-৫.১০সরকারী নীতি সম্পর্কে সচেতনতা

লিঙ্গ	হ্যাঁ	না	বিরত	জানিনা	মোট
পুরুষ	১৮৭	২৮৫	৯০	৩৮	৬০০
মহিলা	২৩	৫৫	৩০	১২	১২০
মোট	২১০	৩৪০	১২০	৫০	৭২০

এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতে গ্রামীণ জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, ৭২০ জন উত্তর দাতার মধ্যে ২১০ জন (২৯ %) উত্তরদাতা হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন, ৩৪০ জন (৪৭ %) উত্তরদাতা না সূচক উত্তর প্রদান করেছে এবং, ১২০ জন (১৭%)উত্তরদাতা উত্তরদানে বিরত থেকেছেন, ৫০ জন (৬.৯%) উত্তরদাতা জানি না বলে উত্তর প্রদান করেছেন। এখানে দেখা যায় যে, যারা শিক্ষিত তাদের মধ্যে ১০০% উত্তরদাতাই হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন, অন্যদিকে যারা না উত্তর প্রদান করেছেন তারা অধিকাংশই নিরক্ষর এবং অল্প শিক্ষিত। শিক্ষার হার যত বেশি সচেতনতার হারও তত বেশী আবার শিক্ষার হার যত কম সচেতনতার হারও তত কম। কাজেই গ্রামের লোকজণের মধ্যে যত বেশী শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া যাবে সরকারী কর্মকান্ড সম্পর্কে তাদের সচেতনতাও তত বাড়বে। এছাড়া আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ব্যক্তিদের সাংসারিক চিন্তা ভাবনা কম থাকায় তারা সরকারের কর্মকান্ড মূল্যায়নে অবকাশ পায় যা অল্প আয়ের লোকদের মাঝে দেখা যায় কম। আবার আধুনিক পেশার সাথে যারা জড়িত, অন্যান্য পেশার লোকদের চেয়ে তারা সরকারী কর্মকান্ড সম্পর্কে বেশী সচেতন। বিশেষ করে গৃহিনী, শ্রমিক ও কৃষির সাথে যারা জড়িত তারা অধিকাংশই জানি না বলে উত্তর প্রদান করেছেন। অতএব, গ্রামীণ জনগণকে রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হতে হলে অবশ্যই আধুনিক পেশার সাথে যুক্ত হতে হবে। আবার দেখা যায়; মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের মধ্যে এ হার অনেক বেশী। এছাড়া যারা নিয়মিত সংবাদপত্র পড়েন, রেডিও / টিভি দেখেন তাদের মধ্যেও অন্যদের চেয়ে সচেতনতার হার অনেক বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

৩। বিরোধী দলের কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা ঃ

রাজনৈতিক সচেতনতায় সরকার, বিরোধীদল, জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত। গ্রামীণ জনগণ বিরোধীদলের কর্মকান্ড সম্পর্কে কতটুকু সচেতন তা জানার জন্য তাদের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল-

* আপনি কি বিরোধী দলের কর্মকান্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন?

সারণী-৫.১১বিরোধীদলের কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতনতা

লিঙ্গ	হ্যাঁ	না	বিরত	মোট
পুরুষ	১৫০	৩৯০	৬০	৬০০
মহিলা	৪	১১০	৬	১২০
মোট	১৫৪	৫০০	৬৬	৭২০

এ প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায় যে, ১৫৪ জন উত্তর দাতা (২১ %) বিরোধীদলের কর্মকান্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন; ৫০০ জন উত্তরদাতা (৬৯%) নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন এবং ৬৬ জন (৯%)উত্তরদাতা উত্তর প্রদানের বিরত থেকেছেন। এখানে দেখা গেছে যে, নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত লোকের চেয়ে শিক্ষার হার যতই বেড়েছে ততই ইতিবাচক উত্তর পাওয়া গেছে। আবার যাদের আয় খুব বেশী তাদের উত্তরে কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। তবে ৫০-৬০ হাজার টাকা যাদের আয় তাদের মধ্যে নেতিবাচক উত্তরই বেশী লক্ষ্য করা গেছে। এখানেও মহিলাদের চেয়ে পুরুষদের সচেতনতার হার বেশী। এছাড়া গণমাধ্যমের সাথে যাদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ তাদের মধ্যেও সচেতনতার হার অধিক। গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রসার গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সচেতনতার হার বৃদ্ধি করবে।

৬.৭ জনসচেতনতা সৃষ্টিতে গণ মাধ্যমের ভূমিকা ঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনসচেতনতা সৃষ্টিতে জাতীয় প্রচার মাধ্যম গুলো নানা ধরনের ভূমিকা পালন করে। বর্তমান গবেষণায় গ্রামাঞ্চলের জনগণের সচেতনতা সৃষ্টিতে গণ মাধ্যম গুলো যেমন- রেডিও, টিভি ইত্যাদি কি ধরনের ভূমিকা পালন করে তা জানার জন্য গবেষণাধীন এলাকার জনগণের মাঝে বেশ কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সচেতনতা মূল্যায়নের জন্য যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল সে গুলো ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধীদলের কর্মকান্ড মূল্যায়নে গণমাধ্যম ঃ

গণতন্ত্রকে একটি আদর্শ এবং সফল শাসন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার একটি পূর্বশর্ত হলো বিরোধী দল বা বিরোধী গ্রুপের কার্যক্রমের পূর্ণ স্বাধীনতা। গণতন্ত্রে বিরোধ থাকলেও তার ভিত্তিতেই রাজনীতির মৌলিক বিষয়গুলোর মিমাংসা করতে হবে। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম শর্ত হলো বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতি আস্থা এবং তার সঠিক মূল্যায়ন করা।

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য ঃ

সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কেবল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই নয়, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অত্যাবশ্যকীয়। তাই বর্তমান গবেষণাধীন এলাকার উত্তরদাতাদের কাছে একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কি মনে করেন জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন?

সারণী-৫.১২সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত

রেডিও/টিভিতে/সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা/শুনা/পড়া	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	জানিনা	মোট
নিয়মিত	৯০	০	০	০	৯০
মাঝে মাঝে	৩৩২	০	২৬	০	৩৫৮
হ্যাঁ	১৯০	৬	৬০	১৬	২৭২
মোট	৬১২	৬	৮৬	১৬	৭২০

গ্রাফটির বিশ্লেষনে দেখা যায়, গণমাধ্যম ব্যবহারকারী ব্যক্তির মধ্যে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব। যারা নিয়মিত রেডিও/ টিভিতে অথবা সংবাদ পত্রে সংবাদ দেখেন বা শুনেন তারা সবাই (১০০%) ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন।যারা মাঝে মাঝে দেখেন বা শুনেন তাদের মধ্যে ৩৩২ জন ৯২% ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন। বাকী ২৬ জন উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে, যারা রেডিও/টিভি/ সংবাদপত্র দেখেনা/ শোনেনা/পড়েনা তাদের মধ্যে ১৯০ জন (৬৯%) উত্তর দাতা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন।

সরকারের কর্মকান্ড পরিচালনায় সহযোগিতার মনোভাব ঃ

গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব অপরিহার্য। আর তাই গ্রামীণ জনগণের মধ্যে সহযোগীতার মনোভাব কতটুকু এবং তাতে জাতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা কতটুকু তা জানার জন্য উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ আপনি কি মনে করেন সরকারের কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সকরের সহযোগিতা করা উচিত?

সারণী-৫.১৩ সরকারের কর্মকান্ড পরিচালনায় সহযোগিতার মনোভাব

রেডিও/টিভিতে/সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা/শুনা/পড়া	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	মোট
নিয়মিত	১০৪	০	০	১০৪
এাঝে মাঝে	২১০	০	১৪	২২৪
হ্যাঁ	৩২৬	৩০	৩৬	৩৯২
মোট	৬৪০	৩০	৫০	৭২০

সারণীর ফলাফল হতে দেখা যায়, যারা নিয়মিত রেডিও/টিভি/সংবাদপত্র দেখেন/শোনে/পড়েন তাদের মধ্যে ১০৪ জন (১০০%), যারা মাঝে মাঝে দেখেন/শোনে/পড়েন তাদের মধ্যে ২১০ জন (৯৪%) এবং যারা রেডিও/টিভি/সংবাদপত্র দেখেন না/ শোনেন না তাদের মধ্যে ৩২৬ জন (৮৩%) উত্তরদাতা সরকারের কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা করা উচিত বলে মনে করেন। অন্যদিকে যারা নেতিবাচক বা নিরুত্তর থেকেছেন তাদের প্রায় সবাই এই গণমাধ্যমগুলো ব্যবহার করেন না।

অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি গুরুত্ব ঃ

অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকলে একদিকে যেমন গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না তেমনি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিও বিকশিত হতে পারে না। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের মধ্যে অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি পরিমাপের জন্য গবেষণা এলাকার উত্তরদাতের প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কি অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরত্ব দেন?

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৫.১৪ অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি গুরুত্ব

রেডিও/টিভিতে/সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা/শুনা/পড়া	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	মোট
নিয়মিত	৩৪	১০	০	৪৪
মাঝে মাঝে	৪৮	১২৪	৬	১৭৮
হ্যাঁ	১১০	২১৮	১৭০	৪৯৮
মোট	১৯২	৩৫২	১৭৬	৭২০

সারণীর ফলাফল হতে দেখা যায়, গণমাধ্যমে ব্যবহারের সাথে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে প্রাধান্য দেয়ার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। নিয়মিত গণমাধ্যমে ব্যবহারে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মানসিকতা তৈরী করে। দেখা যাচ্ছে, যারা নিয়মিত এ গণমাধ্যম গুলো ব্যবহার করছে তাদের মধ্যে ৩৪ জন (৭৭%), যারা মাঝে মাঝে করেন তাদের মধ্যে ৪৮ জন (২৭%) এবং যারা এগুলো ব্যবহার করেন না তাদের মধ্যে ১১০ জন (২২%) উত্তরদাতা অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেয়। যারা নিরুত্তর থেকেছেন তারা কেউই নিয়মিত গনমাধ্যম ব্যবহার করেন না ।

পারস্পরিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস ঃ

গনতান্ত্রিক সংস্কৃতির অন্যতম শর্ত হলো জনগণের পারস্পরিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস।গ্রামীণ জনগণ একজন অন্যের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন কিনা তা জানার জন্য গবেষনাধীন এলাকার উত্তরদাতাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল –আপনি কি পাস্পরিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন

সারণী-৫.১৫ পারস্পরিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস

রেডিও/টিভিতে/সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা/শুনা/পড়া	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	মোট
নিয়মিত	৪০	০	০	৪০
মাঝে মাঝে	১০৪	৮	০	১১২
হ্যাঁ	৫০০	৩৮	৩০	৫৬৮
মোট	৬৪৪	৪৬	৩০	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

নিয়মিত গণমাধ্যম ব্যবহারের ফলে একজন ব্যক্তির মধ্যে স্বাধীন চেতনা, বিশ্বাস ও অন্যের স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে শেখায়। সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, যারা নিয়মিত গণমাধ্যমগুলো ব্যবহার করেন তাদের সবাই (১০০%) এবং যারা মাঝে মাঝে পড়েন তাদের ১০৪ জন (৯৩%) উত্তর দাতা পারস্পরিক স্বাধীনতায় আস্থাশীল ও বিশ্বাসী। অন্যদিকে যারা পারস্পরিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন তাদের সংখ্যা কম এবং তাদের বেশির ভাগই গণমাধ্যম গুলো ব্যবহার করেন না।

রাজনৈতিক আচরনগত সহনশীলতা ঃ

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষের মতামতকে যেমন গুরুত্ব দিতে হবে তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহনশীল আচরণও প্রদর্শন করতে হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগনের রাজনৈতিক আচরণে সহনশীলতার মাত্রা পরিমাপের জন্য গবেষনাধীন এলাকার উত্তরদাতাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল- অন্যের সাথে যখন রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তখন তার আচরণ কেমন হয়?

সারণী-৫.১৬ রাজনৈতিক আচরনগত সহনশীলতা

রেডিও/টিভিতে/সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা/শুনা/পড়া	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	মোট
নিয়মিত	৪০	০	০	৪০
মাঝে মাঝে	১০৪	৮	০	১১২
না	৫০০	৩৮	৩০	৫৬৮
মোট	৬৪৪	৪৬	৩০	৭২০

নিয়মিত গণমাধ্যম ব্যবহার করা ব্যক্তির রাজনৈতিক আচরণের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, যারা নিয়মিত গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তারা রাজনৈতিক তর্ক বির্তক বা আলোচনার ক্ষেত্রে ধৈর্য্যের পরিচয় দেন। যারা মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ১৯%, যারা ব্যবহার করে না তাদের মধ্যে ৬% উত্তরদাতা প্রায়ই রেগে যান বলেছেন। অন্যদিকে যারা নিয়মিত ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৬৮%, যারা মাঝে মাঝে করে তাদের মধ্যে ৩৯% এবং যারা পড়েন না তাদের মধ্যে ৫৭% উত্তরদাতা যথাসম্ভব ধৈর্যশীল ও শান্ত থাকেন বলে জানিয়েছেন। প্রায়ই রেগে যাই এবং যথাসম্ভব ধৈর্যশীল থাকি' এ মর্মে উত্তর দিয়েছেন নিয়মিত ব্যবহার কারীদের ৩৪%, মাঝে মাঝে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহার কারীদের ৪২% এবং যারা করেন না তাদের মধ্যে ১২% উত্তরদাতা। উত্তরদানে বিরত থেকেছেন ২৪% উত্তরদাতা।

বিরোধী দল বা মতের প্রতি সহনশীলতা ঃ

গণতন্ত্রের সার্থকতা এখানেই যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারের বিরোধীতা ও সমালোচনা করার অবাধ সুযোগ থাকে। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের বিরোধী দল বা মতের প্রতি সহনশীলতার মাত্রা নিরূপনের জন্য গবেষাধীন এলাকার উত্তরদাতাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তারা ব্যক্তিগতভাবে যে দল পছন্দ করে তার বিরোধী দল বা মতকে সহ্য করতে পারে কিনা?

403783

সারণী-৫.১৭ বিরোধীদল বা মতের প্রতি সহনশীলতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রেডিও/টিভিতে/সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা/শুনা/পড়া	হ্যাঁ	না	কোন কোন ক্ষেত্রে সহ্য করি	নিরুত্তর	মোট
নিয়মিত	২৬	০	৮	০	৩৪
মাঝে মাঝে	৫৪	৩২	৫৪	১০	১৫০
হ্যাঁ	১৬০	১০৪	৭৬	১৯৬	৫৩৬
মোট	২৪০	১৩৬	১৩৮	২০৬	৭২০

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের বেশিরভাগই বিরোধী দল বা মতের প্রতি সহনশীলতার বিষয়ে ইতিবাচক জবাব দিয়েছেন। আর যারা গণমাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন তারা নেতিবাচক এবং উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন। যারা নিয়মিত গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ২৬ জন (৭৬%), যারা মাঝে মাঝে গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৫৪ জন (৩৬%), যারা ব্যবহার করেন না তাদের মধ্যে ১৬০ জন (৩০%) বিরোধী দল বা মতকে সহ্য করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। যারা মাঝে মাঝে পড়েন তাদের মধ্যে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন ৩২ জন (২১%) এবং যারা সংবাদপত্র পড়েন না তাদের মধ্যে ১০৪ জন (১৯%) নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন। যারা নিয়মিত গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৮ জন (২৪%)

Dhaka University Institutional Repository

যারা মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৫৪ জন (৩৬%), যারা ব্যবহার করেন না তাদের মধ্যে ৭৬ জন (১৪%), কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধীদল বা মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে নিরুত্তর থেকেছেন অনিয়মিতদের মধ্যে ১০ জন (৭%) এবং যারা ব্যবহার করেন না তাদের মধ্যে ১৯৬জন (৩৭%)।

শাসন ব্যবস্থা পছন্দ ঃ

দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা পরিমাপের জন্য গবেষণাধীন এলাকার উত্তরদাতাদের কাছে একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয়েছিল-আপনি কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা পছন্দ করেন?

সারণী-৫.১৭ শাসন ব্যবস্থা পছন্দ

রেডিও/টিভিতে/সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা/শুনা/পড়া	গণতন্ত্র	সামরিক	একনায়কতন্ত্র	ইসলামী শাসন ব্যবস্থা	ডনরুত্তর	মোট
নিয়মিত	৬০	০	০	১৬	০	৭৬
মাঝে মাঝে	১৯৬	৩৬	১৬	৩৮	৬	২৯২
না	১৫২	৫৪	২৬	১০২	১৮	৩৫২
মোট	৪০৮	৯০	৪২	১৫৬	২৪	৭২০

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গণমাধ্যম ব্যবহারের সাথে শাসন ব্যবস্থা পছন্দের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। যারা নিয়মিত গণমাধ্যম ব্যবহার করে তাদের মধ্যে ৬০ জন (৭৯%) গণতন্ত্র ও ১৬ জন (২১%) ইসলামী শাসন পছন্দ করেন। যারা মাঝে মাঝে শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে ১৯৬ জন (৬৭%) গণতন্ত্র, ১৬ জন (৫%) একনায়কতন্ত্র, ৩৬ জন (১২%) সামরিক, ৩৮ জন (১৩%) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, অন্যদিকে যারা গণমাধ্যম ব্যবহার করে না তাদের মধ্যে ১৫২ জন (৪৩%) গণতন্ত্র, ২৬ জন (৭%) একনায়কতন্ত্র, ৫৪ জন (১৫%) সামরিক, ১০২ জন (২৯%) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা পছন্দ করেন। নিরুত্তর থেকেছেন ১৮ জন (৫%) উত্তরদাতা। সুতরাং এ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, গণমাধ্যম ব্যবহারের সাথে শাসন ব্যবস্থা পছন্দের সম্পর্ক বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ঃ

আইনের শাসন বলতে বুঝায় আইনের পূর্ণ প্রধান্য, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং সকলের সমান অধিকার। আর আইনের শাসন হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের আইনের শাসনের প্রতি আস্থা আছে কি না তা জানার জন্য গবেষণাধীন এলাকার জনগণের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল আইনের শাসনকে আপনি কিভাবে দেখেন?

সারণী-৫.১৮ আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

রেডিও/টিভিতে/সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা/শুনা/পড়া	অবশ্যই প্রয়োজনীয় আছে	প্রয়োজন আছে	জানিনা	মোট
নিয়মিত	৪৬	১০	০	৫৬
মাঝে মাঝে	৮০	১৪৪	০	২২৪
না	২৪	৪০৬	১০	৪৪০
মোট	১৫০	৫৬০	১০	৭২০

সারণী থেকে দেখা যায় যে, যারা নিয়মিত গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৪৬ জন (৮২%), যারা মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৮০ জন (৩৬%) এবং যারা ব্যবহার করেন না তাদের মধ্যে ২৪ জন (৫%) উত্তরদাতা অবশ্যই আইনের শাসনের প্রয়োজন আছে বলে উত্তরদান করেন। অন্যদিকে যারা নিয়মিত গণমাধ্যম ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ১০ জন (১৮%), যারা মাঝে মাঝে ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ১৪৪ জন (৬৪%) এবং যারা ব্যবহার করেন না তাদের মধ্যে ৪০৬ জন (৯২%) আইনের শাসনের প্রয়োজন আছে বলে উত্তরদান করেন। ফলে দেখা যাচ্ছে, গণমাধ্যম ব্যবহারের ফলে আইনের শাসন সম্পর্কে জ্ঞান বিকশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য পঞ্জিকা

১। মাসুম, আব্দুল লতিফ, "বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির ভাষাঃ একটি বিশ্লেষণ", নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৫, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-২০০০।

২। Brient, Michael, A genealogy of politial culture, westview press, **1991, p-4**

৩। **Almond G.A and Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach, Boston, 1950**

৪। **Pye Lucian, political culture and political Development, Princeton, New Jersey, 1965.**

৫। মান্নান, অধ্যাপক মোঃ আবদুল, বাংলাদেশে গণতন্ত্র সমস্যা ও সম্ভাবনা, আফসার ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী ২০০২, পৃঃ ৯

৬। **Bhatia, H. S (ed), Origin and development of legal and political system in India. Vol. 1 Deep and Deep publications, 1976, P: 49**

৭। **Calarendon, John W. Spellman, Political theory of Ancient India, Oxford press, 1964, P:16**

৮। **Jather, R.V. Evolution of panchayat Raj in India, Institute of Economic Research, Dharwar, 1964, P: 11**

৯। রায়, সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা ১৯৮০, পৃঃ ১৭

১০। **Choudhury, G.W. Democracy in Pakistan, Univeristy of British Columbia, 1963, P: 2**

১১। **Brass, Paul R. The Politics of India Science Independence, Cambridge University press, 1990, P: 5**

১২। **Chowdhuri, Muzzaffer Ahmed, Government and politics in Pakistan, Puthigar Ltd. East Pakistan, 1968, P: 10**

১৩। **Ibid, P. 184**

Dhaka University Institutional Repository

১৪। Jahan, Rounaq, Pakistan; Failure in nalional Integration,Oxford University press, 1973, Pq; 38-41

১৫। Ibid, Pp. 110-120

১৬। Ahmed, Moudud, Bangladesh; Constitutional Quest for Autonomy. 1950-1971, UPL, Dacca, 1979, P. 88

১৭। Quoted in Hasanuzzaman, Al Masud, OP. cit, P.p. 37-38.

১৮। Chowdhuri Committee Report, 1972, Part-11, Para-9, 54, 63, pp-286-289.

১৯। Jahan, Rounaq, Bangladesh politics: Problems and Issues, UPL, 1980, P-197.

২০। Hossain, Golam, Civil Military Relation in Bangladesh: A comparative Study, Academic Publishers, Dhaka, 1991, p. 38.

২১। Khan, Zillur Rahman, Marlial Law to Martial Law: Leadership crisis in Bangladesh, UPL, Dhaka, 1984, P.189.

২২। Almond and Verba, The civic Culture, 1963.

২৩। I, Frolov (ed), Dictionary of philosophy, progress publishers, Moscow, 1984, p.81

২৪। Gould, Julius and Kolb william L.A Dictionary of Social Sciences, The Free Press. New York, 1964

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব , সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের স্বরূপ ও সরকারের জবাবদিহিতা

৬.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধরণ

৬.২ রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণাবলী

৬.৩ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা

৬.৪ নারী নেতৃত্ব

৬.৫ প্রার্থী নির্বাচনে নির্ধারক

৬.৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহনের স্বরূপ

Dhaka University Institutional Repository

সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। আর এ রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোতে জনগন গুরুত্ব দেয় তা এই অধ্যায়ে বিশেষণের চেষ্টা করা হবে। এছাড়াও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগন কিভাবে অংশগ্রহণ করে তাও এ অধ্যায়ে দেখার চেষ্টা করা হবে।

৬.১ বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ঃ

যে কোন প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। যোগ্য নেতৃত্বের আশীর্বাদে একটি সমাজ সফলতার শিখরে উঠতে পারে।আবার অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে কোন সমাজ ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যেতে পারে। সঠিক নেতৃত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের বিশাল কর্মকান্ডকে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে সহায়তা করে।বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। জনতাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে জাতির ললাটে গৌরবের জয়টিকা পরাতে রাজনৈতিক নেতাদের সুযোগ্য নেতৃত্ব অত্যাবশ্যক।

নেতৃত্ব বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলীকে বুঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্ব বলতে কোন ব্যাক্তি বা দলের কর্মদক্ষতা। এবং সেই অমোঘ গুণাবলীকে বুঝায় যা অপরকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী জাতীয় নেতৃত্বঃ

পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত দেশটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সকল দিক দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নির্যাতিত ও শোষিত হতো। কিন্তু দুর্বার বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সকল প্রকার গোলামীর অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর সঠিক নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করে।১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে পরিচালিত দল আওয়ামীলীগ ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে ২৯৩ টি আসন লাভ করে।বাংলার জনগণের কাছে প্রচন্ড জনপ্রিয় এই ব্যক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যতটা সফলতা পেয়েছিলেন,দেশ পরিচালনায় কিন্তু তিনি এতটা সফল হতে পারেননি। তার সরকারের আমলাগণের দূর্নীতি,মন্ত্রীদের দূর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয় কোন্দল,রাজনৈতিক সংকট,সেনাবাহিনীর প্রতি উপেক্ষা,তাদের ব্যক্তিগত প্রতি হিংসা,দুর্ভিক্ষ,আইন শৃংখলার অবনতি ইত্যাদি কারণে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট আওয়ামীলীগ সরকারের পতন হয় এবং বঙ্গবন্ধুকে তার পরিবারসহ হত্যা করা হয়। তিনি নিহত হবার পর তার মন্ত্রীসভার সদস্য খন্দকার মোশতাক ১৬ই আগষ্ট রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। দেশে সামরিক আইন জারী হয়। এরপর ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু ৭ই নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তার পতন হয়। দেশে সামরিক শাসন চলতে থাকে। নেতৃত্বে আসেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৭ সালের ২৯শে এপ্রিল জেনারেল জিয়া

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েমের পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন। ক্ষমতায় এসে তিনি তার ক্ষমতা বেসামরিকীকরণ বা বৈধ করে নেন।১৯৮১ সালের ৩০শে মে সামরিক বাহিনী কর্তৃক জেরারেল জিয়া নিহত হন এবং বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু শাসন কার্য পরিচালনায় ব্যর্থতা, দলীয় কোন্দল , দূর্নীতির প্রসার ইত্যাদি কারণে বি,এন,পি, সরকারের পতন হয় এবং ১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ লেঃ জেনারেল এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং সামরিক আইন জারী করেন। ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৯ বছর তিনি স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে যান। কিন্তু ১৯৯০ সালের প্রত্যক্ষ গণঅভ্যুত্থানের ঢেউয়ে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৯১ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বি,এন,পি পুনরায় ক্ষমতায় আসে। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করা হয়।কিন্তু ব্যাপক দুর্নীতি,দলীয়করণ,সন্ত্রাস,১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রহসনমূলক নির্বাচন,বিরোধী দলের সাথে সুসম্পর্ক না থাকায় গণ আন্দোলনের মুখে নির্বাচিত এই সরকার পদত্যাগ করে এবং আবার বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা দেয়। ১৯৯৬সালের ১২ই জুন তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসে। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামীলীগ সরকার তাদের শাসন কাজ শুরু করেন।

কিন্তু সেই সরকারের আমলেও আগেকার সরকার গুলোর মত প্রশাসনে দূর্নীতি,স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, বিরোধী দলের অযৌক্তিক ইস্যু নিয়ে আন্দোলন, দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দেবার মত সঠিক নেতৃত্ব মেলেনি। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর তৃতীয়বারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি,এন,পি'র নেতৃত্বে চারদলীয় ঐক্যজোট ক্ষমতায় আসে। এই সরকারের আমলেও আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের বৈশিষ্ট্য ঃ

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতাদের যে সব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো ঃ

১. বাংলাদেশের নেতৃত্বে বর্তমানে অভিজ্ঞ লোকের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা প্রায় দেখাই যায় না।

৩. সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মত বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নেতার অভাব।

৪. নেতাদের মধ্যে সহনশীলতা ও আত্মসংযমের অভাব।

৫. প্রয়োজনে কঠোর ও কোমল হবার মত নেতা নেই বললেই চলে।

৬. জাতীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতার সংকট।

৭. দূর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বর্তমান নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

৮. নিরপেক্ষ নেতা এদেশে বর্তমানে প্রায় নেই।

৯. শিক্ষিত নেতার অভাব ইত্যাদি ।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশের নেতাদের যেসব অযোগ্যতা রয়েছে তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে নেতৃত্বের সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যোগ্য নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বাংলাদেশের নেতাদের যেসব যোগ্যতা দেখা যায় তার ফলে এখানকার গণতন্ত্র ভীষণভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বর্তমানে যেসব কারণে গণতন্ত্র বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

২. সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অভাব।

৩. সংসদে অযোগ্য প্রতিনিধি।

৪. সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব।

৫. অনমনীয় মনোভাব।

৬. স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ প্রবণতা ইত্যাদি।

৬.২ রাজনৈতিক নেতৃত্বের গুণাবলী:

ব্যক্তিগত গুণাবলীর দ্বারাই ব্যক্তি সমাজে আদর্শবান লোক হিসাবে বিবেচিত হন। একজন জনপ্রতিনিধির ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা বা প্রতিনিধি হিসেবে সমাজে তার প্রভাব বিস্তার বা আকর্ষণ করার যোগ্যতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিগত গুণাবলীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে James Clotfelter Ges Charles L. Prysby বলেছেন,

"Voters judge candidates by their personal characteristics as well as by their issue stands. Infact the perception of the personal attributes of the candidates probably is the most important influence on the vote."[১]

Alan R. Ball বলেছেন,

"The personality of candidates and issues may be factor in persuading the voters to change his party allegience."[২]

Geoffrey Brennan Ges Loren Lomasky তাদের *Democracy and Decision* গ্রন্থে প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলী সম্পর্কে বলেছেন যে, নৈতিক মূল্যবোধ সহ ব্যক্তিগত গুণাবলী একজন প্রতিনিধির আবশ্যকীয় গুণ।[৩] উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশে ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে একজন প্রার্থী নির্বাচনে জয়ী হয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাহাম লিংকন , জন এফ. কেনেডী, ফ্রান্কলিন রুজভেল্ট, রিগ্যান, আইজেন হাওয়ার,

Dhaka University Institutional Repository

মালয়েশিয়ার মাহাথির মোহাম্মদ এর কথা বলা যায় যারা ব্যক্তি ইমেজের কারণে নির্বাচনে তাদের প্রবল প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

Philip E. Converse Ges Georges Dupeux তাদের "De Gulle and Eisenhower: The Public Image of the Victorious General" প্রবন্ধে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলীর প্রভাব আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, দ্যা গল এবং আইজেন হাওয়ার তাদের ব্যক্তিগত ইমেজের কারণে কোন নির্বাচনে পরাজিত হননি।[৪]

এ অধ্যায়ে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলীকে জাতীয় নির্বাচনে জনগণ কিভাবে মূল্যায়ন করেন তা কতগুলো চলকের মাধ্যমে বিশেষণ করার চেষ্টা করা হবে:

১. প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা।

২. প্রার্থীর নাগরিক সংশিষ্টতা।

৩. প্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী।

৪. প্রার্থীর সততা।

১.প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা:

মানুষের মানবীয় গুণাবলী বিকাশে এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে শিক্ষা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা একজন প্রতিনিধির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত গুণাবলী, কারণ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বুঝতে পারেন সমাজ ও দেশের প্রকৃত সমস্যা এবং তা সমাধান করার কার্যকর উপায়।

সারণী ৬.১: প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা (ভোটারের বয়স অনুসারে)

উয়স	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
১৮-২৫	১২১	১৫	০০	১৩৬
২৬-৩৫	২১৮	৪৫	০০	২৬৩
৩৬-৪৫	১৫১	৪৫	০০	১৯৬
৪৬-৫৫	৫৭	৩০	০০	৮৭
৫৬-৬৫	০৮	১৫	০০	২৩
৬৫+	১১	০৪	০০	১৫
মোট	৫৬৬	১৫৪	০০	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, ১৮-২৫ বছর বয়সী নাগরিকগণ ভোটদানের ক্ষেত্রে ১২১ জন (৮৯%) ২৬-৩৫ বছর বয়সী ২১৮ জন(৮৩%), ৩৬-৪৫ বছর বয়সী ১৫১ জন (৭৭%), ৪৬-৫৫ বছর বয়সী ৫৭ জন (৬৬%),৫৬-৬৫ বছর বয়সী ৮৭ জন (৩৫%) ৬৫ ও তদুর্ধ বয়সী ১১ জন (৭৩%) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা করে ভোট প্রদান করে থাকেন। সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা তার গুণাবলী গুলোর মধ্যে অন্যতম।এবং অধিকাংশ ভোটারই তা বিবেচনা করে ভোট প্রদান করে ।

সারণী ৬.২ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা (শিক্ষার ভিত্তিতে)

শিক্ষা	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
নিরক্ষর	২৯৬	০৬	০০	৩০২
প্রাইমারী	১২৫	০৫	০০	১৩০
নিম্ন মাধ্যমিক	১৩৭	০১	০০	১৩৮
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১১৬	০২	০০	১১৮
স্নাতক+	৩২	০০	০০	৩২
মোট	৭০৬	১৪	০০	৭২০

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মোট ৭২০ জন ভোটারের মধ্যে ৭০৬ জন (৯৮%) ভোটার প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতাকে একটি বিশেষ গুণ বলে মনে করেন।

সারণী ৬.৩ ঃ সারণী-প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা(আয়ের ভিত্তিতে)

আয়	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
<২০,০০০	৮৮	১৭	০	১০৫
২০,০০১-৩০,০০০	৮৬	০৬	০	৯২
৩০,০০১-৪০,০০০	১২৪	২৯	০	১৫৩
৪০,০০১-৫০,০০০	১৩৮	২০	০	১৫৮
৫০,০০১-৬০,০০০	১৫৬	২২	০	১৭৮
৬০,০০১+	৩২	০২	০	৩৪
মোট	৫৯৮	১২২	০	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৭২০ জনের ভেতর ৫৯৮ জন (৮৩%) ভোটার প্রার্থী নির্বাচনে শিক্ষাগত যোগ্যতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক বলে মনে করেন । এছাড়া আয় বাড়ার সাথে সাথে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির হারও বেড়েছে।

২.প্রার্থীর নাগরিক সংশ্লিষ্টতা :

একজন ব্যক্তি কিভাবে এবং কি পরিমাণ অপরের সহচর্যে যেতে পারেন তার উপরই নির্ভর করে তার নাগরিক সংশ্লি-ষ্টতা। নাগরিক সংশষ্টতার মাধ্যমেই জনপ্রতিনিধি সমাজের প্রকৃত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। আর তাই নাগরিক সংশ্লিষ্টতা একজন জনপ্রতিনিধির অন্যতম গুণ বা যোগ্যতা।

সারণী ৬.৪

প্রার্থীর নাগরিক সংশ্লিষ্টতা(বয়সের ভিত্তিতে)

বয়স (বছর)	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
১৮-২৫	১২৪	১১	০	১৩৫
২৬-৩৫	২০৩	৪৪	০	২৪৭
৩৬-৪৫	১৪৫	৪৫	০	১৯০
৪৬-৫৫	৫৭	৩০	০	৮৭
৫৬-৬৫	১৫	১৫	০	৩০
৬৬+	১১	২০	০	৩১
মোট	৫৫৫	১৬৫	০	৭২০

সারণী ৬.৪ বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, ৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৫৫ জন(৭৭%) ভোটার প্রার্থীর নাগরিক সংশি-ষ্টতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন। ১৬৫ জন (৩৭%) ভোটার তা করেন না। দেখা যাচ্ছে, ১৮-৪৫ বছর বয়সী ভোটার এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৫ঃ প্রথীর নাগরিক সংশ্লিষ্টতা (শিক্ষার ভিত্তিতে)

শিক্ষা	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
নিরক্ষর	২৯০	০৯	০০	২৯৯
প্রাইমারী	১২৫	০৬	০০	১৩১
নিম্ন মাধ্যমিক	১৩৯	০১	০০	১৪০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১১৬	০২	০০	১১৮
স্নাতক+	৩২	০০	০০	৩২
মোট	৭০২	১৮	০০	৭২০

সারণী ৬.৫ থেকে দেখা যাচ্ছে , ৭০২ জন(৯৮%) উত্তরদাতা প্রার্থীর নাগরিক সংশিষ্টতা যাচাই করেন। শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে এ বিষয়ে সচেতনার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী ৬.৬

প্রার্থীর নাগরিক সংশিষ্টতা (আয়ের ভিত্তিতে)

আয়	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
<২০,০০০	১৬	৩৫	০০	৫১
২০,০০১-৩০,০০০	২৩০	১২	০০	২৪২
৩০,০০১-৪০,০০০	১৭৭	৪৩	০০	২২০
৪০,০০১-৫০,০০০	৮৯	৪৫	০০	১৩৪
৫০,০০১-৬০,০০০	২০	২০	০০	৪০
৬০,০০১+	৩০	০৩	০০	৩৩
মোট	৫৬২	১৫৮	০০	৭২০

সারণী ৬.৬ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৫৬২ জন (৭৮%) উত্তরদাতা প্রার্থীর নাগরিক সংশিষ্টতা বিবেচনা করেন। এক্ষেত্রেও আয় বাড়ার সাথে সাথে সচেতদনতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.প্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী বিবেচনা

সারণী- ৬.৭ ঃপ্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী (বয়সের ভিত্তিতে)

বয়স (বছর)	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
১৮-২৫	১১৯	১৪	০০	১৩৩
২৬-৩৫	২০৩	৪৫	০০	২৪৮
৩৬-৪৫	১৪০	৪৬	০০	১৮৬
৪৬-৫৫	৬২	৩০	০০	৯২
৫৬-৬৫	১৫	১৫	০০	৩০
৬৬+	১১	২০	০০	৩১
মোট	৫৫০	১৭০	০০	৭২০

সারণী ৬.৭ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৫৫০ জন (৭৬%) উত্তরদাতা প্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী বিবেচনা করেন। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে,১৮-৪৫ বছর বয়সের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতার হার বেশি।

সারণী-৬.৮ ঃ প্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী (শিক্ষার ভিত্তিতে)

শিক্ষা	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
নিরক্ষর	১১	১৬০	০০	১৭১
প্রাইমারী	০৬	১৯০	০০	১৯৬
নিম্ন মাধ্যমিক	১৮০	০২	০০	১৮২
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১৪০	০১	০০	১৪১
স্নাতক+	৩০	০০	০০	৩০
মোট	৩৬৭	৩৫৩	০০	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৮ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৩৬৭ জন (৫০.৯%) উত্তরদাতা প্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী বিবেচনা করে করে ভোট প্রদান করেন। আবার ৩৫৩ জন (৪৯%) উত্তরদাতা তা বিবেচনা করেন না। এক্ষেত্রেও শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে সচেতনতার হার বৃদ্ধি পায় । যারা প্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী বিবেচনা করেন না তারা অধিকাংশই নিরক্ষর ও অল্প শিক্ষিত।

সারণী -৬.৯ ঃ প্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী (আয়ের ভিত্তিতে)

আয়	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
<২০,০০০	০৮	১৭০	০০	১৭৮
২০,০০১-৩০,০০০	১৩০	১৮০	০০	৩১০
৩০,০০১-৪০,০০০	৭০	১১	০০	৮১
৪০,০০১-৫০,০০০	১০০	০৮	০০	১০৮
৫০,০০১-৬০,০০০	১২	০১	০০	১৩
৬০,০০১+	৩০	০১	০০	৩০
মোট	৩৫০	৩৭০	০০	৭২০

সারণী ৬.৯ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৩৫০ জন (৪৮.৬%) উত্তরদাতা প্রার্থীর নেতৃত্বদানের গুণাবলী বিবেচনা করেন। অন্যদিকে ৩৭০ জন(৫১.৩৮%) উত্তরদাতা এটি বিচেনা করেন না। তারা অধিকাংশই স্বল্প আয় করেন।৪০,০০১-৫০,০০০ টাকা আয়ের উত্তরদাতাতের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতার হার বেশী। অর্থাত আয় বাড়ার সাথে সাথে এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়।

৪.প্রার্থীর সততা

সততা মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে অন্যতম। যে ব্যক্তির মধ্যে সততা নেই তার পক্ষে যে কোন জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করা সম্ভব এবং ঐ ব্যক্তি কখনও দেশ ও জাতির কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। নির্বাচনের মাধ্যমে প্রার্থী হিসাবে বিজয়ী হয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে চাইলে একজন প্রতিনিধিকে অবশ্যই সৎ গুণাবলীও অর্জন করতে হবে। প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটারগণ প্রার্থীর সততাকে কিভাবে মূল্যায়ন করে তা বিশ্লেষণ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী-৬.১০ প্রার্থীর সততা বিবেচনা (বয়সের ভিত্তিতে)

বয়স (বছর)	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
১৮-২৫	১৪৫	৩০	০০	১৭৫
২৬-৩৫	১৯৮	২৬	০০	২২৪
৩৬-৪৫	১৩০	৪২	০০	১৭২
৪৬-৫৫	৬২	২৫	০০	৮৭
৫৬-৬৫	১৫	১২	০০	২৭
৬৬+	২৫	১০	০০	৩৫
মোট	৫৭৫	১৪৫	০০	৭২০

সারণী ৬.১০ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৭৫ জন (৭৯.৮৬%) উত্তরদাতা প্রার্থীও সততা বিবেচনা করে ভোট দান করেন। অন্যদিকে ১৪৫ জন(২০.১৩%) উত্তরদাতা এটি বিবেচনা করেন না।

৬.১১ প্রার্থীর সততা বিবেচনা (শিক্ষার ভিত্তিতে)

শিক্ষা	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
নিরক্ষর	১০০	৭২	০০	১৭২
প্রাইমারী	৭১	৭০	০০	১৪১
নিম্নমাধ্যমিক	২০৫	২১	০০	২২৬
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১৫০	০০	০০	১৫০
স্নাতক+	৩১	০০	০০	৩১
মোট	৫৫৭	১৬৩	০০	৭২০

সারণী ৬.১১ থেকে দেখা যাচ্ছে, ৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৫৭ জন (৭৭.৩৬%) উত্তরদাতা প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থীর সততা বিবেচনা করেন। শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে এক্ষেত্রে সচেতনতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৬.১২ প্রার্থীর সততা বিবেচনা (আয়ের ভিত্তিতে)

আয়	হ্যাঁ	না	জানিনা	মোট
<২০,০০০	২০০	৬৫	০৯	২৭৪
২০,০০১-৩০,০০০	১৬০	৩৫	০১	১৯৬
৩০,০০১-৪০,০০০	৫৫	৫০	০০	১০৫
৪০,০০১-৫০,০০০	৭০	০৮	০০	৭৮
৫০,০০১-৬০,০০০	৩৫	০২	০০	৩৭
৬০,০০১+	৩০	০০	০০	৩০
মোট	৫৫০	১৬০	১০	৭২০

সারণী ৬.১২ থেকে দেখা যায়, ৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫৫০ জন(৭৬.৩৮%)উত্তরদাতা প্রার্থী নির্বাচনে সততাকে গুরুত্ব দেন। যারা এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেন না তাদের মধ্যে <২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা আয়ের উত্তরদাতাই বেশি। আয় বাড়ার সাথে এই বিষয়ে সচেতনতার হারও বেড়েছে।

৬.৩ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা

গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার জন্য সরকারের কর্মকান্ডের প্রতি আস্থাশীলতার পাশাপাশি নেতৃত্বের প্রতিও আস্থাশীল হওয়া একান্ত আবশ্যক। এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা পরিমাপের ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ের নেতৃত্বের প্রতি গ্রামীণ জনগণের আস্থা পরিমাপের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬.১৩ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থা (শিক্ষার ভিত্তিতে)

শিক্ষা	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	মোট
নিরক্ষর	২২৩	৭৬	৩৮	৩৩৭
প্রাইমারী	৮৩	২৮	১১	১২২
নিম্ন মাধ্যমিক	৮৮	১৭	০৫	১১০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১১৩	০৩	০৩	১১৯
স্নাতক+	২১	০৮	০৩	৩২
মোট	৫২৮	১৩২	৬০	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতার সম্পর্ক রয়েছে। ৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৫২৮ জন (৭৩.৩৩%) উত্তরদাতা রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল বলে জানিয়েছেন। আস্থাশীল নন ১৩২ জন (১৮.৩৩%) উত্তরদাতা। চিত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যারা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত এবং যারা স্নাতক বা তার উর্ধ্বে শিক্ষিত তাদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা কম এবং এদের মধ্যে নেতিবাচক ও নিরুত্তরের প্রবণতা বেশি। এর অন্যতম কারণ হল , যারা বেশি শিক্ষিত তারা নেতৃত্বকে পুরোপুরি মূল্যায়নে সক্ষম আর যারা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত তারা নেতৃত্বকে তেমনটা মূল্যায়নে সক্ষম নয়। অন্যদিকে , মাঝামাঝি শিক্ষিতদের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা বেশি।

৬.৪ নারী নেতৃত্বের প্রতি মনোভাব ঃ

গণতন্ত্রে নারী , পুরুষ , জাতি , ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয় । বিশেষ করে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮(১),২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১),২৯(২) এবং ৬৫(৩) নং ধারা অনুযায়ী নারী - পুরুষের মধ্যে কোন ধরণের বৈষম্য রাখা হয়নি। তাছাড়া দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের প্রধান দুজনই মহিলা হলেও রাজনীতিতে তূলনামূলকভাবে নারীরা পিছিয়ে।এ প্রেক্ষাপটে নারী নেতৃত্বের প্রতি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগনের আস্থা ও বিশ্বাস বা মনোভাব কেমন তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নকে সামনে রেখেই গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিলঃ নারী নেতৃত্বকে আপনি কিভাবে দেখেন? এ অংশে নারী নেতৃত্বের প্রতি গ্রামীণ জনগণের মনোভাবের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণী ৬.১৪ ঃ শিক্ষার ভিত্তিতে নারী নেতৃত্ব সমর্থনের মাত্রার বন্টন (% হারে)

শিক্ষা	সমর্থন করি	সমর্থন করি না	বিরোধিতা করি	নিরুত্তর	মোট
নিরক্ষর	১৯০	৯৯	৩০	১০	৩২৯
প্রাইমারী	৫৫	৪১	২০	৮	১২৪
নিম্ন মাধ্যমিক	৭৭	৩০	১১	২	১২০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৯৩	১৭	৫	০	১১৫
স্নাতক +	২৫	৫	২	০	৩২
মোট	৪৪০	১৯২	৬৮	২০	৭২০

সারণী ৬.১৪ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৪৪০ জন (৬১.১%) উত্তরদাতা নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করেন, ১৯২ জন(২৬.৭%)উত্তরদাতা সমর্থন করেন না, ৬৮ জন(৬.৫%) বিরোধিতা করেন এবং ২০ জন (৫.৭%) নিরুত্তর

Dhaka University Institutional Repository

থেকেছেন। এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল হল =০.০৬২। কাজেই বলা যায় যে, নারী নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন বাড়বে তখনই যখন শিক্ষার হার আরও বৃদ্ধি পাবে।

সারণী ৬.১৫ঃ বয়সের ভিত্তিতে নারী নেতৃত্বকে সমর্থনের মাত্রার বন্টন(% হারে)

বয়স	সমর্থন করি	সমর্থন করি না	বিরোধিতা করি	নিরুত্তর	মোট
১৮-২৫	১৩৫	১৯	৩	২৫	১৮২
২৬-৩৫	১৪৩	৬০	২৫	১১	২৩৯
৩৬-৪৫	৭২	৪১	৬	৩	১২২
৪৬-৫৫	৫৫	২৫	১৩	০	৯৩
৫৬-৬৫	২২	৩৮	০	২	৬২
৬৬+	১৩	৯	০	০	২২
+মোট	৪৪০	১৯২	৪৭	৪১	৭২০

সারণী ৬.১৫ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং মধ্যবয়সী উত্তরদাতাদের মধ্যে নারী নেতৃত্বকে সমর্থনের প্রবণতা বেশি। অন্যদিকে, বয়স্ক বিশেষ করে ৫৬-৬৫ বছর বয়সের রেঞ্জে নারী নেতৃত্বের প্রতি সমর্থনের মাত্রা কম। ৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৪৪০ জন (৬১.১১%) নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করেন, ১৯২ জন(২৬.৬৬%) উত্তরদাতা নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করেন না, ৪৭ জন(৬.৫২%) বিরোধিতা করেন এবং ৪১ জন(৫.৬৯%) উত্তরদাতা নিরুত্তর থেকেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, বয়সের সাথে নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

সারণী ৬.১৬ ঃ ধর্মের ভিত্তিতে নারী নেতৃত্ব সমর্থনের মাত্রার বন্টন(% হারে)

ধর্ম	সমর্থন করি	সমর্থন করি না	বিরোধিতা করি	নিরুত্তর	মোট
ইসলাম	২৮৩	১৩৭	৪২	৪১	৫০৩
হিন্দু	১৫৭	৫৫	৫	০	২১৭
মোট	৪৪০	১৯২	৪৭	৪১	৭২০

সারণী ৬.১৬ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ধর্মের সাথে নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করার সম্পর্ক অত্যন্ত প্রবল । ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের তুলনায় হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে নারী নেতৃত্বকে মেনে নেওয়া ও সমর্থন করার প্রবণতা বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

আবার বিরোধিতা করার প্রবণতাও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বেশি। এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল =০.০০৩ যা গভীর সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

৬.৫ প্রার্থী নির্বাচনে নির্ধারকঃ

উন্নয়নশীল এবং উন্নত উভয় দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শুধুমাত্র দলীয় পরিচিতির কারণে বা নিজস্ব মতাদর্শের জন্য ভোটারগণ কোন প্রার্থীকে প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেন। কারণ এর সাথে জড়িত থাকে ব্যক্তির রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব। গবেষকগণ ভোট সংক্রান্ত আচরণ বিষয়ে দলগত পরিচিতির উপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। কতকগুলো নির্ভরশীল চলকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের প্রার্থী নির্বাচনের নির্ধারক হিসেবে প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচিতির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

ক. প্রার্থীর রাজনৈতিক দল বিবেচনা

খ. প্রার্থীর মতাদর্শ বিবেচনা

গ. প্রার্থীর নির্বাচনী অঙ্গীকার বিবেচনা

ঘ. নির্বাচনী জোয়ারকে প্রাধান্য দান।

ক . প্রার্থীর রাজনৈতিক দল বিবেচনাঃ

রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো রাজনৈতিক দল। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তিশালী হাতিয়ার হল রাজনৈতিক দল। বর্তমানে নির্বাচনী রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে রাজনৈতিক দলের কথা বলা হয় । রাজনৈতিক দল নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও ফলাফলকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায়যে, জাতীয় নির্বাচেনে দলীয় পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় পরিচিতির তেমন গুরুত্ব নেই।

সারণী -৬.১৮ঃ শিক্ষার ভিত্তিতে

শিক্ষা	হ্যাঁ	না	জানি না	নিরুত্তর	মোট
নিরক্ষর	৪৫	৭৫	৭	২০	১৪৭
প্রাইমারী	৮৩	১৭৩	৫	১৫	২৭৬
নিম্ন মাধ্যমিক	৮৩	৯৪	৩	৭	১৮৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৩৪	৫৩	০	০	৮৭
স্নাতক+	১৫	৮	০	০	২৩
মোট	২৬০	৪০৩	১৫	৪২	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২৬০ জন(৩৬%) উত্তরদাতা প্রার্থী নির্বাচনে রাজনৈতিক দল বিবেচনা করেন , ৪০৩ জন (৫৫.৯৭%) করেন না, ১৫ জন (২.০৮%) জানি না বলেছেন এবং ৪২ জন(৫.৮৩%) উত্তরদাতা নিরুত্তর থেকেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রার্থীর রাজনৈতিক দল বিবেচনায় সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। যে কোন রাজনৈতিক দল নির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামোর নির্ধারক হিসেবে এই রাজনৈতিক মতাদর্শের গুরুত্ব অপরিসীম।আদর্শিক বিশ্বাস বা মতাদর্শ প্রার্থী নির্বাচনের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

খ. প্রার্থীর মতাদর্শ বিবেচনাঃ

ইংরেজী " Ideology" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে মতাদর্শ কথাটি ব্যবহার করা হয়। যে কোন দেশের অধিবাসীদের রাজনীতি বিষয়ক মনোভাব , মূল্যবোধ , দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্বাস প্রাধান্যকারী রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে । সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিশেষ কোন আদর্শ বা ভাবকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ধারণাগত কাঠামো হল মতাদর্শ । অনেকের মতে মতাদর্শ হল মানুষ , সমাজ ও বিশ্ব সংসার সংক্রান্ত মতামত, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত সুসংগঠিত চিন্ত ভাবনা ।

সারণী ৬.১৯: প্রার্থীর মতাদর্শ বিবেচনা (শিক্ষার ভিত্তিতে)

শিক্ষা	হ্যাঁ	না	জানি না	নিরুত্তর	মোট
নিরক্ষর	৩০	৬৮	১০	৫	১১৩
প্রাইমারী	৫৭	১৫৫	২০	৪০	২৭২
নিম্ন মাধ্যমিক	৮৭	৪৫	৪০	৩০	২০২
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৫২	১৬	১০	৫	৮৩
স্নাতক+	২৭	৮	৫	১০	৫০
মোট	২৫৩	২৯২	৮৫	৯	৭২০

সারণী বিশেষণে দেখা যায় , ২৫৩ জন(৩৫.১৩%) উত্তরদাতা প্রার্থী নির্বাচনে মতাদর্শ বিবেচনা করেন , ২৯২ জন (৪০.৫৫%) করেন না, ৮৫ জন (১১.৮০%) জানি না বলেছেন এবং ৯০ জন(১২.৫%) উত্তরদাতা নিরুত্তর থেকেছেন। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রার্থীর মতাদর্শ বিবেচনার হারও বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ. নির্বাচনী অঙ্গীকার বিবেচনা

অঙ্গীকার বলতে বুঝায় কোন বিষয়ে মৌখিক প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কারো কাছে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, কথামত ঐ ব্যক্তি কাজ সম্পাদন করবে। অঙ্গীকার নির্বাচনের একটি বিশেষ দিক। প্রত্যেক প্রার্থী তার জনসমর্থন আদায় করার জন্য জগণের নিকট বিভিন্ন ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। যাতে জনসাধারণ তাদেরকে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রার্থীরা জয়ী হবার পর তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন না । তথাপি ভোটারগণ এই প্রতিশ্রুতিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করে থাকেন। উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় দেশে অঙ্গীকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব লাভ করে।

সারণী ঃ ৬.২০ ঃ প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থীর নির্বাচনী অঙ্গীকারকে বিবেচনা(শিক্ষার ভিত্তিতে)

শিক্ষা	হ্যাঁ	না	জানি না	নিরুত্তর	মোট
নিরক্ষর	৪৯	৬৪	৮	১২	১৩৩
প্রাইমারী	৯৪	১৭০	০	০	২৬৪
নিম্ন মাধ্যমিক	৯৮	৮৭	৫	৮	১৯৮
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৫৩	৩৪	০	০	৮৭
স্নাতক+	১৯	১৯	০	০	৩৮
মোট	৩১৩	৩৭৪	১৩	২০	৭২০

সারণী-৬.২০ থেকে দেখা যায় যে,অধিকাংশ উত্তরদাতাই প্রথী নির্বাচনে নির্বচনী অঙ্গীকারকে বিবেচনা করেননা। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত উত্তরদাতা এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। নিরক্ষর ও প্রাইমারী পর্যন্ত যারা পড়াশোনা করেছেন তারা এটিকে বিবেচনা কম করেন।

ঘ. নির্বাচনী জোয়ারকে প্রাধান্য দানঃ

ভোটারদের ভেতর একটি অংশ থাকে যারা সুনির্দিষ্টভাবে কোন দলকে সমর্থন করে না বা এদের নির্ধারিত পছন্দের কোন প্রার্থী থাকে না। যখন নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ হয় তখন এই শ্রেণীর ভোটারগণ নির্বাচনী জোয়ার অবলোকন করে প্রার্থীকে মনোনয়ন দান করেন। সাধারণতঃ কোন দলের বা প্রার্থীর সমর্থক ভোটার ঐ প্রার্থী বা দলকে ভোট প্রদান করেন নির্দিধায়। আর তাই দলগুলোর এ ধরণের সমর্থন হারাবার ভয় খুব একটা থাকেনা। যারা অন্ধ সমর্থক নয়, তাদের প্রদত্ত ভোটের উপর নির্বাচনী ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে । আর তাই প্রার্থীরা এ ধরণের ভোটারদের

Dhaka University Institutional Repository

ভোট পাবার আশায় নানা ধরণের কৌশল অবলম্বন করেন। নির্বাচনী জোয়ার অর্থাৎ কোন প্রার্থী বা দলের জনপ্রিয়তা বেশি তা এ ধরনের ভোটারগণ বেশ গুরুত্ব দেন এবং অবস্থার ওপর নির্ভর করে ভোট প্রদান করেন। প্রার্থী নির্বাচনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

জাতীয় নির্বাচনে ১৮-২৫ বছর বয়সের ১ জন (২.৮%), ২৬-৩৫ বছর বয়সের ১০%, ৩৬-৪৫ বছর বয়সের ২০ জন(৩৮.৫%),৪৬-৫৫ বছর বয়সের ৩ জন (১৩%), ৫৬-৬৫ বছর বয়সের ১ জন(১৬.৭%), ৬৫ বছর বয়সের উর্ধ্বের বয়সের ১ জন(২৫%) ভোটার প্রার্থী নির্বাচনে নির্বাচনী জোয়ারকে বিবেচনা করেন বলে উত্তর প্রদান করেছেন। ভোটারের বয়সের সাথে প্রার্থী নির্বাচনে নির্বাচনী জোয়ারকে বিবেচনায় ঘনিষ্ঠ ও তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় (স্থানীয় ও জাতীয় উভয় নির্বাচনে কাইবর্গেও ফলাফল ০.০০০)।

প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রার্থীর রাজনৈতিক উপাদানের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,রাজনৈতিক দল , মতাদর্শ প্রভৃতি নির্ধারকসমূহ জাতীয় নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হিসেবে কাজ করলেও স্থানীয় নির্বাচনে এগুলোর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সথে শিক্ষাসহ অন্যান্য উপাদানগুলোর বৃদ্ধিতে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভোটারের ধর্মের সাথে প্রার্থী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলকে কম গুরুত্ব প্রদান করে বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য গবেষণায় দেখা যায় যে, হিন্দু ধর্মের অনুসারী মহিলা অপেক্ষাকৃত কম রাজনৈতিক দলের সাথে মানসিকভাবে সংযুক্ত থাকেন।

জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচনী প্রতীক একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও গ্রামীণ ভোটারদের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রার্থী নির্বাচনে জাতীয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচনী প্রতীক গুরুত্বপূর্ণ হলেও গ্রামীণ ভোটারগণ এর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। বিশ্লেষণ থেকে আরও প্রতীয়মান হয়েছে যে, অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের ভোটাররা প্রার্থীর রাজনৈতিক উপাদান দ্বারা কম প্রভাবিত হয়েছেন । অর্থাৎ তারা প্রার্থী নির্বাচনের সময় প্রার্থীর রাজনৈতিক দল , মতাদর্শ , নির্বাচনী অঙ্গীকার , নির্বাচনী ইশতেহার , নির্বাচনী প্রতীক, নির্বাচনী জোয়ার প্রভৃতি বিষয়গুলোকে কম প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার বিশেষণে দেখা গেছে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সকল রাজনৈতিক উপাদান বিবেচনার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অধিকহারে প্রার্থীর রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে প্রার্থী নির্বাচনে প্রাধান্য দিয়েছেন।

সুতরাং সার্বিক প্রেক্ষাপটে বলা যায় প্রার্থী নির্বাচনে গ্রামীণ জনগণ প্রার্থীর রাজনৈতিক উপাদান দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয় না। গ্রামীণ জনগণের অশিক্ষা , রাজনৈতিক অসচেতনতা প্রভৃতিকে এর কারণ হিসেবে উলেখ করা যেতে পারে। অর্থাৎ গ্রামীণ জনগণ এখনও রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

৬.৬ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগনের অংশগ্রহণের স্বরূপ ঃ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হল অন্যতম পূর্বশর্ত। যদিও সকল জনগন সচেতনভাবে গণতন্ত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি ধারা সৃষ্টি করতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কিছু গড়পড়তা নাগরিকের অংশগ্রহন (Average citizen to participate) প্রয়োজন হয়। গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের কেবল সুযোগই সৃষ্টি করে দেয় না বরং নিজের কার্যকারিতার জন্যই এটি তা দাবি করে।[৫] রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হল স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রমের একটি অনুক্রম যার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর একটি প্রভাব থাকে। শাসক নির্বাচন ও জননীতি প্রণয়নের মতো বিভিন্ন ইস্যুগুলো এ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হলঃ

১। নির্বাচনে ভোট দেয়া;

২। সদস্য হয়ে সম্ভাব্য চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহকে সমর্থন দেওয়া;

৩। আইন প্রণেতাদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রক্ষা করা;

৪। রাজনৈতিক দলীয় কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ; এবং

৫। অন্যান্য নাগরিকের সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় নিয়োজিত হওয়া।[৬]

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি বিশেষণের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন ধরণ 'Mode' বিশেষণের কথা বলেছেন। বিশেষ করে Almond Ges Verba তাদের The civic Culture গ্রন্থে সংস্কৃতির মানদন্ডে যখন ৫টি দেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিশেষণ করেন তখন তারা রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ভোটদান, রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ, দলের সাথে সংযুক্তি ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় এনেছেন। [৭] বর্তমান গবেষণা কর্মটিতেও রাজনৈতিক অংশগ্রহণকে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি চলক হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বিষয়টিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়কে পরীক্ষা করা হয়েছে। এজন্য তিনটি বিষয় বিশ্লেষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সেগুলো হলঃ

১। ভোট দান;

২। রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্তি; এবং

৩। রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

ভোট দান

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটদান (Voting) হচ্ছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ রূপ (Common mode)। একে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রথাগত রূপ (Conventional forms of political participation) বলেও অভিহিত করা হয়।[৮] এর মাধ্যমে মানুষের রাজনৈতিক মানসিকতার সক্রিয় প্রতিফলন পাওয়া যায়। ভোটের মাধ্যমে জনগন শাসক শ্রেনীর প্রতি তাদের সমর্থন বা অসমর্থনের প্রকাশ ঘটাতে পারে।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কেবল গণতন্ত্রকে কার্যকর করার লক্ষ্যেই জরুরী নয় বরং জনগণের মধ্যে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ধারা এবং গণতন্ত্রকে কার্যকরার জন্য উপযুক্ত গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণের জন্য বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু Dahl এর মতে, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সকল জনগণ সমানভাবে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিছু লোক থাকে সক্রিয় এবং কিছু লোক রাজনীতির প্রতি উদাসীন। যারা সক্রিয় তাদের মধ্যেও আবার কিছু লোক থাকে সক্রিয়ভাবে ক্ষমতাকাঙ্খী। আর যারা ক্ষমতাকাঙ্খী তাদের মধ্যেও কিছু লোক থাকে যারা অন্যের তুলনায় বেশি ক্ষমতা করায়ত্ব করতে চায়। ফলে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ৪টি স্তর গড়ে উঠে।[৯] এগুলো হলঃ

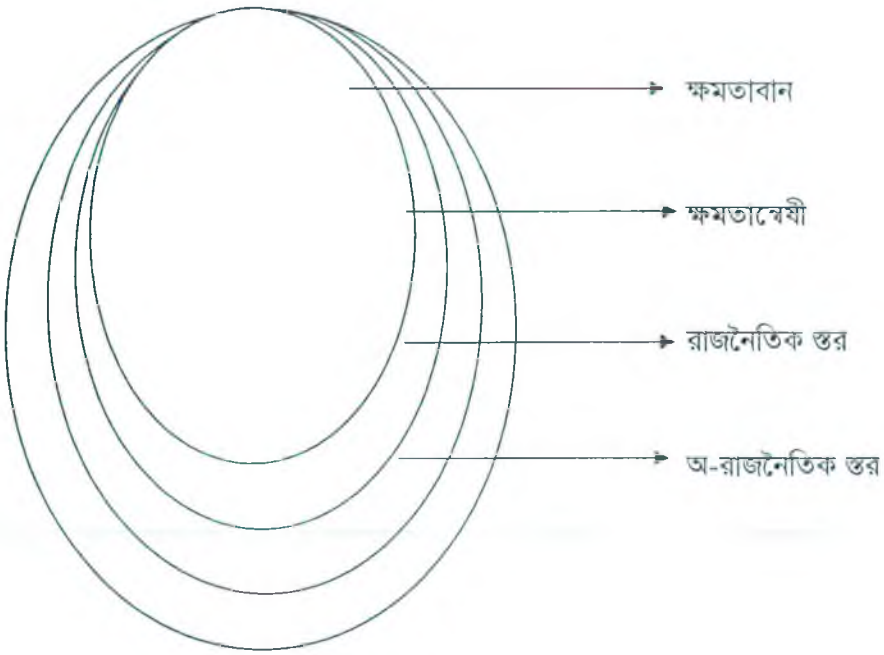

চিত্রঃ রাজনৈতিক স্তরসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

W.L. Miller মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও ভোটাচারণের প্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রিত চলকগুলোর বিশেষণ তুলে ধরে একটি মডেল তুলে ধরেছেন।[১০]

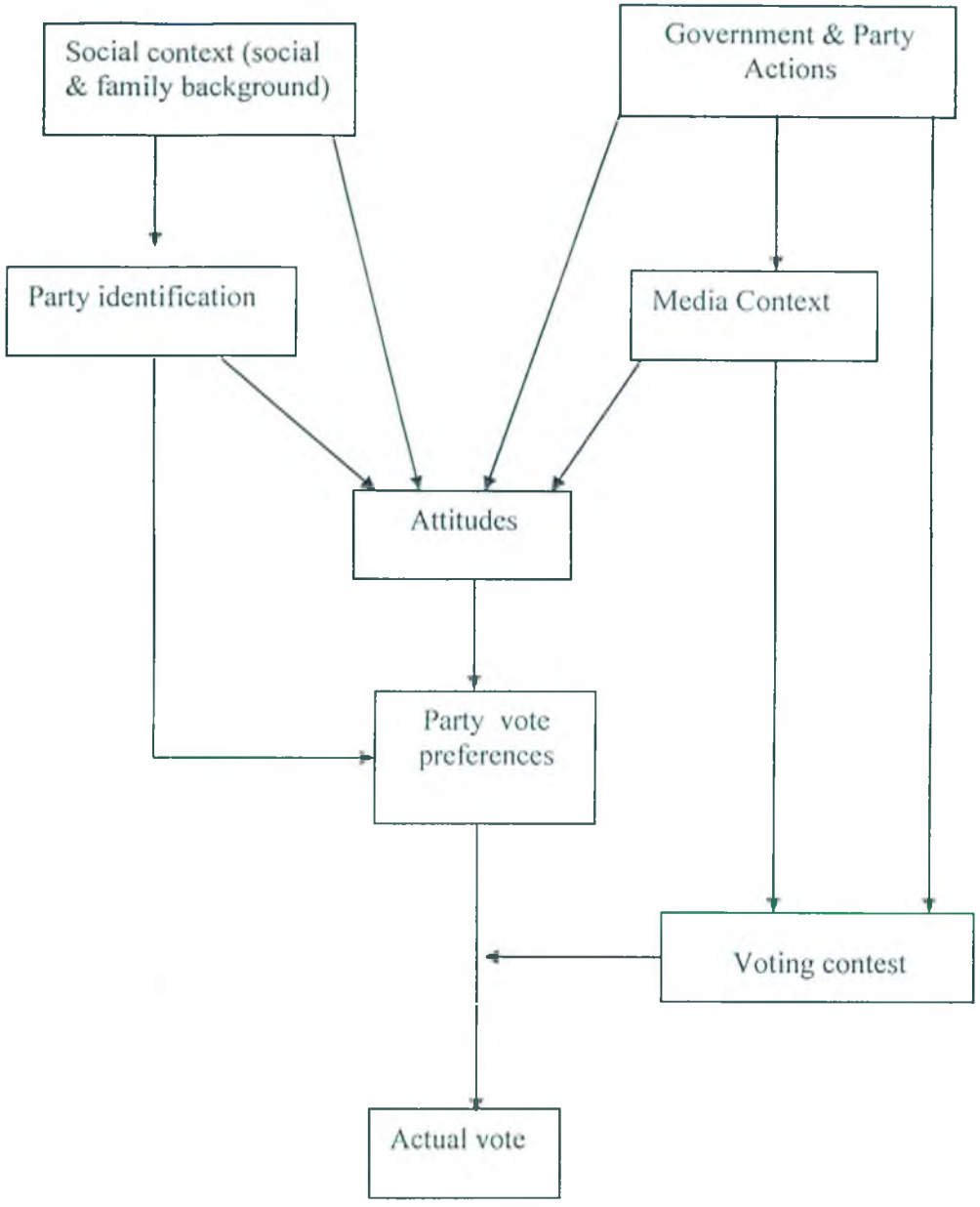

(Figure-2:A General model of voting)

(Source: W.L. Miller, "Political Participation and Voting Behaviour" in Hawekesworth Mary & Maurice Kogan (ed), Encylopedia of Government & Politics, London, 1992, p. 433.)

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গবেষণায় ভোটদানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি পরিমাপের জন্য গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের সবাইকে একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয় এবং তা হলঃ আপনি কি ভোট প্রদান করেন।

সারণী ঃ ৬.২১ ঃ বয়সের ভিত্তিতে ভোট প্রদানের হার বন্টন(%হারে)

	ভোট প্রদান				
বয়স	নিয়মিত	অনিয়মিত	না	প্রযোজ্য নয়	মোট
১৮-২৫	১২১	০৮	২৬	২৪	১৮৯
২৬-৩৫	১৪০	৯৩	০০	০০	২৩৩
৩৬-৪৫	৭৭	৪৪	০০	০০	১২১
৪৬-৫৫	৫৮	৩৬	০০	০০	৯৪
৫৬-৬৫	৩০	৩৩	০০	০২	৬৫
৬৬+	০৫	১৭	০৩	০৩	২৮
মোট	৪৩১	২৩১	২৯	২৯	৭২০

ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক হতে পারে। উন্নত দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স থেকে সংগৃহীত উপাত্ত প্রমাণ করে যে, অল্প বয়সী যুবক ও অতি বৃদ্ধদের অপেক্ষা মধ্য বয়সী লোকদের ভোট দানের প্রবণতা বেশি। ৬.২১ নং চিত্র থেকেও সেই বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে। তবে চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, অল্প বয়সী যুবক-বৃদ্ধ ও মধ্য বয়সীদের ভোট দানের প্রতি আগ্রহ বেশি। চিত্রে উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৮-২৫ বছরের ১২১ (৬৬.৭%),২৬-৩৫ বছরের ১৪০ (৫৮.৬%), ৩৬-৪৫ বছরের ৭৭ (৬৩,৬%), ৪৬-৫৫ বছরের ৫৮ (৬১.৮%), ৫৬-৬৫ বছরের ৩০ (৪৭.৫%) এবং ৬৬ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের মধ্যে ৫জন (২৫.০%) উত্তরদাতা নিয়মিত ভোট প্রদান করেন। অন্যদিকে, ১৮-২৫ বছরের ৮ (৪.৫%), ২৬-৩৫ বছরের ৯৩ (৩৯.১%), ৩৬-৪৫ বছরের ৪৪ (৩৬.৪%), ৪৬.৫৫ বছরের ৩৬ (৩৮.২%), ৫৬-৬৫ বছরের ৩৩ (৫২.২%) এবং ৬৬ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের মধ্যে ১৭ (৭৫.০%) উত্তদাতা অনিয়মিত ভোট প্রদান করেন। যারা ভোট প্রদান করেন না (৬.১%) তাদের প্রায় সবাই যুবক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভোট প্রদানের সাথে ব্যক্তির বয়সের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এখানে কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ঃ৬.২২ ঃ পেশার ভিত্তিতে ভোট প্রদানের বন্টন।

	ভোট প্রদান				
পেশা	নিয়মিত	অনিয়মিত	না	প্রযোজ্য নয়	মোট
চাকুরি	৪০	১২	৩	০	৫৫
গৃহিনী	৬০	৫৫	৫	০	১২০
ব্যবসা	৫৬	৬০	০	১০	১২৬
শ্রমিক	৩৯	৬০	০	১২	১১১
কৃষি	৭০	৭৮	৮১	৩০	২৫৯
ছাত্র	৩০	০	১১	৮	৪৯
মোট	২৭৫	২৬৫	১০০	৬০	৭২০

সারণি ৬.২২ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পেশার সাথে ভোট প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। সারণিতে উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা চাকুরিজীবি তাদের মধ্যে ৪০.০% গৃহিনীদের মধ্যে ৫০%, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৭১.৯%, শ্রমিকদের মধ্যে ৮১.৯% কৃষকদের মধ্যে ৬৩.৪%,ছাত্রদের মধ্যে ৫২.৯% এবং অন্যান্য পেশায় যারা নিয়োজিত তাদের মধ্যে ৫০.৯% উত্তরদাতা নিয়মিত ভোট প্রদান করেন। অন্যদিকে, অনিয়মিত ভোট প্রদান করেন চাকুরিজীবিদের মধ্যে ৪৬.৭%, গৃহিনীদের মধ্যে ৩৩.৩%, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ২৮.১%, শ্রমিকদের মধ্যে ১৮.২%, কৃষকদের মধ্যে ৩১.৭%, ছাত্রদের মধ্যে কেউ না এবং অন্যান্য পেশায় যারা নিয়োজিত তাদের মধ্যে ৪১.৫% উত্তরদাতা। যারা ভোট প্রদান করেন না তার মধ্যে গৃহিনী, ছাত্র এবং অন্যান্য উত্তরদাতা অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং দেখা যায় যে, পেশার সাথে ভোট প্রদানের গভীর সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল= ০.০০০) রয়েছে।

চিত্র-৬.২৩ ঃ শিক্ষার ভিত্তিতে ভোট প্রদানের বন্টন (% হারে)

শিক্ষা	নিয়মিত	অনিয়মিত	[illegible] না	নিরুত্তর	মোট
নিরক্ষর	২২০	১১০	২২	১০	৩৬২
প্রাইমারী	৫৮	৫০	১০	৪	১২২
নিম্ন মাধ্যমিক	৮২	২২	৮	০	১১২
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৪৯	৩৮	৪	০	৯১
স্নাতক +	২২	১১	০	০	৩৩
মোট	৪৩১	২৩১	৪৪	১৪	৭২০

শিক্ষা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা চলক হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। চিত্র ৬.২৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যারা নিরক্ষর বা অক্ষরজ্ঞানহীন তাদের মধ্যে ২২০ জন (৬৫.০%), যারা প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন তাদের মধ্যে ৫৮ জন (৪৭.৭%), নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা পড়াশুনা করেছেন তাদের মধ্যে ৮২ জন ((৭৫.০%), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন তাদের মধ্যে ৪৯ জন (৪১.৯%) এবং স্নাতক বা এর উর্ধ্বে যারা পড়াশুনা করেছেন তাদের মধ্যে ২২ জন (৬৬.৭%) উত্তরদাতা নিয়মিত ভোট প্রদান করেন। অন্যদিকে উত্তরদাতাদের মধ্যে যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে ১১০ (৩২.৫%), যারা প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন তাদের মধ্যে ৫c জন (৪০.৯%) নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা পড়াশুনা করেছেন তাদের মধ্যে ২২ জন (২০.০%), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা পড়াশুনা করেছেন তাদের মধ্যে ৩৮ জন (৩২.৬%) এবং স্নাতক বা এর উর্ধ্বে যারা পড়াশুনা করেছেন তাদের মধ্যে ১১ জন (৩৩.৩%) উত্তরদাতা অনিয়মিত ভোট প্রদান করেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ভোট প্রদান করেন না ৪৪ জন। ভোটাদের এই অংশগ্রহণের হারের মোট হিসাব করলে দেখা যায় যে, নিয়মিত অনিয়মিত মিলে ৯২.০% ভাগ ভোটার ভোটপ্রদানে অংশগ্রহণ করেন। ভোটারদের এই অংশগ্রহণের হার পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত সমাজের অংশগ্রহণের সাথে তুলনীয়। সুতরাং দেখা যায় যে, শিক্ষার সাথে ভোট প্রদানের কার্যকারণ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০) বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৬.২৪ঃ রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার ভিত্তিতে ভোট প্রদানের হার বন্টন(%হারে)

	ভোট প্রদান				
রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখা	নিয়মিত	অনিয়মিত	না	প্রযোজ্য নয়	মোট
নিয়মিত	৪৭	১১	৩	১১	৭২
মাঝে মাঝে	১৫৬	৮৫	২২	৩	২৬৬
না	২২৮	১৩৫	১৯	০	৩৮২
মোট	৪৩১	২৩১	৪৪	১৪	৭২০

সারণি ৬.২৪ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার সাথে ভোট প্রদানের সম্পর্ক রয়েছে। যারা নিয়মিত রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনে তাদের মধ্যে ৪৭ জন(৬৫.৪%),যারা মাঝে মাঝে রেডিও/টিভিতে সংবাদ দেখে বা শুনে তাদের মধ্যে ১৫৬ জন (৫৮.৮%) এবং যারা সংবাদ দেখে না বা শুনে না তাদের মধ্যে ২২৮ জন (৫৯.৭%) উত্তরদাতা নিয়মিত ভোট প্রদান করে। পক্ষান্তরে, যারা নিয়মিত রেডিও/টিভিতে সংবাদ দেখে বা শুনে তাদের মধ্যে ১১ জন (১৫.৪%), যারা মাঝে মাঝে সংবাদ শুনে বা দেখে তাদের মধ্যে ৮৫ জন (৩২.০%) এবং যারা সংবাদ শুনে না বা দেখে না তাদের মধ্যে ১৩৫ জন (৩৫.৩%) অনিয়মিত ভোট প্রদান করে। সুতরাং দেখা যায় যে, রেডিও/টিভিতে সংবাদ দেখা বা শুনা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল= ০.০০০।

এছাড়া অন্যান্য চলকের সাথে ভোটপ্রদানের তেমন কোনো সম্পর্কে পরিলক্ষিত হয় নি বলে গবেষণায় সেগুলো উলেখ করা হয় নি।

রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা ঃ

রাজনৈতিক দলের সাথে ব্যক্তির সম্পৃক্ত হবার মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি বিভিন্ন শর্ত (Conditions) যেমন- সামাজিক, মনঃস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমান গবেষণায় রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা পরিমাপের জন্য গবেষণা এলাকার ৭২০ জন উত্তদাতাকে একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয়ঃ যদি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকেন তাহলে কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে ৪১

Dhaka University Institutional Repository

জন(৫.৭%)সক্রিয়,৪৩৭ জন(৬০.৭%)সমর্থক,৯৩ জন(১৩%)সহানুভূতিশীল,১৪৮ জন(২০.৬%)নিরুত্তর বলে উত্তর প্রদান করেছেন।

সারণি - ৬.২৫ঃ শিক্ষার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার বন্টন (% হারে)

শিক্ষা	সক্রিয়	সমর্থক	সহানুভূতিশীল	নিরুত্তর	মোট
নিরক্ষর	০	১৭৬	৭০	৯১	৩৩৭
প্রাইমারী	০	৬৬	১৪	৪১	১২১
নিম্ন মাধ্যমিক	৩	৯১	৫	১১	১১০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৩৩	৭৭	৩	৬	১১৯
স্নাতক +	৬	২৭	০	০	৩৩
মোট	৪২	৪৩৭	৯২	১৪৯	৭২০

চিত্র ৬.২৫ থেকে দেখা যায় যে, নিরক্ষরদের এবং প্রাইমারী পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে কেউ সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত নয়। নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৩ জন (২.৫%), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৩৩ জন (২৭.৯%) এবং স্নাতক বা এর উর্ধ্বে যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৬ জন (১৬.৭%) সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অপরদিকে, নিরক্ষরদের মধ্যে ১৭৬ জন (৫২.০%) ,প্রাইমারী পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৬৬ জন (৫৪.৫%), নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৯১ জন (৮২.৫%), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৭৭ জন (৬৫.১%) এবং স্নাতক বা তার উর্ধ্বে যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ২৭ জন (৮৩.৩%) উত্তরদাতা কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। রাজনৈতিক দলের প্রতি সহানুভূতিশীল এমন উত্তরদাতাদের মধ্যে নিরক্ষর ৭০ জন (২১.১%), প্রাইমারী ১৪ জন (১১.৪%), নিম্ন মাধ্যমিক ৫ জন (৫.০%) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ৩ জন (২.৩%)। নিরুত্তর থেকেছে যথাক্রমে নিরক্ষরদের মধ্যে ৯১ জন (২৬.৮%), প্রাইমারী ৪১ জন (৩৪.০%), নিম্ন মাধ্যমিক ১১ জন (১০.০%) এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষিতদের মধ্যে ৬ (৪.৬%)। এখন তথ্যের Trend বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যারা অধিক শিক্ষিত তারা হয় কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী নয়ত সমর্থক। অন্যদিকে, যারা অপেক্ষকৃত কম শিক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

তাদের অধিকাংশই হয় কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক না হয় সহানুভুতিশীল। সেই সাথে তাদের মধ্যে নিরুত্তরের প্রবণতাও বেশি। সুতরাং দেখা যায় যে, শিক্ষার সাথে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততার গভীর সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০) বিদ্যমান।

সারণি ঃ ৬.২৬ ঃ আয়ের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকার বন্টন (% হারে)।

আয়	সক্রিয়	সমর্থক	সহানুভূতিশীল	ডনরুত্তর	মোট
<২০,০০০	৩	৭১	০	৩৮	১১২
২০,০০১-৩০,০০০	০	৯৩	৪২	৪৯	১৮৪
৩০,০০১-৪০,০০০	৩	১৫৯	৪৫	৪৭	২৫৪
৪০,০০১-৫০,০০০	৮	৩৮	০	৩	৪৯
৫০,০০১-৬০,০০০	৩	১৪	০	৩	২০
৬০,০০১+	২৫	৬০	৮	৮	১০১
মোট	৪২	৪৩৫	৯৫	১৪৮	৭২০

চিত্র ৬.২৬ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পারিবারিক আয়ের সাথে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হবার গভীর সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল= ০.০০০) বিদ্যমান। তথ্যের Trend বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যাদের পারিবারিক আয় উচ্চ তারা রাজনীতিতে সক্রিয়। অন্যদিকে, যাদের আয় কম তাদের বেশির ভাগই হয় সমর্থক না হয় সহানুভূতিশীল। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যাদের আয় ২০,০০০ টাকার নিচে তাদের মধ্যে ৩ জন (১.৮%), যাদের আয় ২,০০০১-৩০,০০০ টাকা তাদের মধ্যে কেউ না, যাদের আয় ৩০,০০১-৪০,০০০ টাকা তাদের মধ্যে ৩ জন(১.২%),যাদের আয় ৪০,০০১-৫০,০০০ টাকা তাদের মধ্যে ৮ জন (১৬.৭%), যাদের আয় ৫০,০০১-৬০,০০০ টাকা তাদের মধ্যে ৩ জন (১৪.৩%) এবং যাদের আয় ৬০,০০১ টাকার অধিক তাদের মধ্যে ২৫ জন (২৪.৩%) সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। অপরদিকে, যাদের আয় ২০,০০০ টাকার নিচে তাদের মধ্যে ৭১ জন (৪৭.৩%), যাদের আয় ২০,০০১-৩০,০০০ টাকা তাদের মধ্যে ৯৩ জন (৫৪.০%), যাদের আয় ৩০,০০১-৪০,০০০ টাকা তাদের মধ্যে ১৫৯ জন (৭০.৭%), যাদের আয় ৪০,০০১-৫০,০০০ টাকা তাদের মধ্যে ৩৮ জন (৭৭.৮%), যাদের আয় ৫০,০০১-৬০,০০০ টাকা তাদের মধ্যে ১৪ জন (৭১.৪%) এবং যাদের আয় ৬০,০০১ টাকার উর্ধ্বে তাদের মধ্যে ৬০ জন (৫৯.৫%))কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক। সহানুভূতিশীলদের মধ্যে ৮ জন (৮.১%) যাদের আয় ৬০ হাজারের উর্ধ্বে বাকী উত্তরদাতার আয় ২০-৪০ হাজারের মধ্যে। যারা উত্তরদানে বিরত

Dhaka University Institutional Repository

থেকেছেন তাদের মধ্যে ২০,০০০ টাকার নিচে আয়ের ৩৮ জন (২৪.৪%), ২০,০০১-৩০,০০০ টাকা আয়ের মধ্যে ৪৯জন (২৮.৬%), ৩০,০০১-৪০,০০০ টাকা আয়ের মধ্যে ৪৭ জন (২০.৭%), ৪০,০০১-৫০,০০০ টাকা আয়ের ৩ জন(৫.৬%),৫০,০০১-৬০,০০০ টাকা আয়ের ৩ জন(১৪.৩%)।এবং ৬০,০০১ টাকার উর্ধ্বে আয়ের মধ্যে ৮ জন (৮.১%) উত্তরদাতা। সুতরাং আয়ের সাথে রাজনৈতিক সলের সাথে সম্পৃক্ততার সম্পর্ক বিদ্যমান।

রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ ঃ

রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কেননা, ব্যক্তির মধ্যে যদি রাজনীতির প্রতি আগ্রহ থাকে তাহলে সে দৈনন্দিন জীবনে কোন না কোনোভাবে পরিবার কিংবা সমাজের অন্যান্যদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় অবতীর্ণ হবে। বর্তমান গবেষনায় বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণের মাত্রা পরিমাপের লক্ষ্যে গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের সকলকে দুটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয় তা হলঃ (১) আপনি পরিবারের সদস্যদের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন? এবং (২) আপনি কি পরিবারের সদস্যদের বাইরে অন্যান্যদের সাথে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন?

সারণী-৬.২৭ ঃ শিক্ষার ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনার বন্টন(%হারে)

শিক্ষা	নিয়মিত	মাঝে মাঝে	না	মোট
নিরক্ষর	০	০	৫৩০	৫৩০
প্রাইমারী	০	৩	৬০	৬৩
নিম্ন মাধ্যমিক	৩	৭	৩৮	৪৮
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৪	১৯	৭	৩০
স্নাতক +	৭	৪০	২	৪৯
মোট	১৪	৬৯	৬৩৭	৭২০

শিক্ষা রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসাবে কাজ করে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার সাথে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনায় গভীর সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল= ০.০০০) বিদ্যমান।৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১৪ জন(১.৯%) নিয়মিত পরিবারের সদস্যদের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন,মাঝে মাঝে আলোচনা করেন ৬৯ জন(৯.৫%) এবং কখনো আলোচনা করেননা ৬৩৭

Dhaka University Institutional Repository

জন(৮৮.৫%) উত্তরদাতা। চিত্রে Trend বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনার মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, শিক্ষার হার যত কম রাজনীতির বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলোচনার প্রবণতাও তত কম।

সারণী -৬.২৮ ঃপারিবারিক আয়ের সাথে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনার হার(%হারে)

আয়	নিয়মিত	মাঝে মাঝে	না	মোট
<২০,০০০	০	০	৫৪৫	৫৪৫
২০,০০১-৩০,০০০	০	০	৭১	৭১
৩০,০০১-৪০,০০০	২	১৭	৬	২৫
৪০,০০১-৫০,০০০	০	২০	৭	২৭
৫০,০০১-৬০,০০০	০	১০	৬	১৬
৬০,০০১+	১১	২২	৩	৩৬
মোট	১৩	৬৯	৬৩৮	৭২০

চিত্র ৬.২৮ নং থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পারিবারিক আয়ের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলোচনার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল= ০.০০০) বিদ্যমান। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, যাদের আয় কম তাদের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনার মাত্রাও কম। আর যাদের আয় তুলনামূলক ভাবে বেশি তাদের মধ্যে আলোচনার মাত্রাও বেশি। নিয়মিত রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মাত্র ১৩ জন (১.৯%) উত্তরদাতা। তাদের মধ্যে ৬০,০০০ টাকার উর্ধ্বে ১১ জন,বাকী ২ জন ৩০-৪০ হাজার টাকা আয়ের মধ্যে। মাঝে মাঝে যারা পরিবারের সদস্যদের সাথে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন তাদের মধ্যে একই প্রবণতা বিদ্যমান। মাঝে মাঝে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মাত্র ৬৯ জন (৯.৫%) উত্তরদাতা। যাদের মধ্যে মধ্য ও উচ্চ আয়ের উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে, রাজনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন না ৬৩৮ জন (৮৮.৫%)। সুতরাং চিত্রে দেখা যায় যে, বেশির ভাগই রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন না এবং রাজনৈতিক আলোচনা আয় দ্বারা প্রভাবিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৬.২৯ঃ রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা ও দেখার ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনার বন্টন(%হারে)

	পরিবারের সদস্যদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা			
রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা ও দেখা	নিয়মিত	মাঝে মাঝে	না	মোট
নিয়মিত	১১	২৭	৩৩	৭১
মাঝে মাঝে	৩	৩৮	২২৫	২৬৬
না	০	৩	৩৮০	৩৮৩
মোট	১৪	৬৮	৬৩৮	৭২০

সারণি ৬.২৯ এ দেখা যাচ্ছে যে, রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার সাথে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক আলোচনার গভীর সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০) বিদ্যমান। কারণ, যারা রেডিও/টিভিতে সংবাদ দেখেন বা শুনেন তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিষয়ে সচেতনতার সৃষ্টি হয়। সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, যারা নিয়মিত সংবাদ দেখেন বা শুনেন তাদের মধ্যে ১১ জন (১৫.৪%), যারা মাঝে মাঝে সংবাদ দেখেন বা শুনেন তাদের মধ্যে ৩ জন (১.০%) উত্তরদাতা নিয়মিত পরিবারের সদস্যদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে, যারা নিয়মিত সংবাদ দেখেন বা শুনেন তাদের মধ্যে ২৭ জন (৩৮.৫%), যারা মাঝে মাঝে দেখেন বা শুনেন তাদের মধ্যে ৩৮ জন (১৪.৪%) এবং যারা দেখেন না বা শুনেন না তাদের মধ্যে ৩ জন (০.০৭%) উত্তরদাতা মাঝে মাঝে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না নিয়মিতদের মধ্যে ৩৩ জন (৪৬.২%), মাঝে মাঝে ২২৫ জন (৮৪.৫%) এবং যারা সংবাদ দেখেন বা শুনেন না তাদের মধ্যে ৩৮০ জন (৯৯.৩%) উত্তরদাতা।

পরিবারের সদস্যদের বাইরে অন্যান্যদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ।

রাজনীতির বিষয় নিয়ে অন্যান্যদের সাথে আলোচনা রাজনৈতিক অংশগ্রহণ পরিমাপের একটি অন্যতম বিষয় বা নির্ধারক। আলোচ্য অধ্যায়ে গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহন পরিমাপের জন্য গবেষণা এলাকার ৭২০ জন উত্তরদাতার নিকট প্রশ্ন ছিলঃ আপনি কি পরিবারের সদস্যদের বাইরে অন্যান্যদের সাথে রাজনীতির বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন বা শুনেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাগণ যে উত্তর প্রদান করেছেন তাতে দেখা যায় যে, ৫২ জন (৭.৩%) উত্তরদাতা নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন, ২৭৮ জন (৩৮.৫%)মাঝে মাঝে এবং ৩৯০ জন (৫৪.২%) উত্তরদাতা কখনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাচনা করেন না বা শুনেন না। এক্ষেত্রে যে সকল ডেমোগ্রাফিক চলক মূল প্রভাবক হিসেবে করে তা উল্লেখ হলঃ

সারণি- ৬.৩০ শিক্ষার ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের বন্টন।

শিক্ষা	নিয়মিত	মাঝে মাঝে	না	মোট
নিরক্ষর	০	৯১	২৪৭	৩৩৮
প্রাইমারী	০	৪৭	৭৪	১২১
নিম্ন মাধ্যমিক	৩	৬৩	৪৪	১১০
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৩০	৬৩	২৫	১১৮
স্নাতক +	১৯	১৪	০	৩৩
মোট	৫২	২৭৮	৩৯০	৭২০

শিক্ষা রাজনৈতিক আলোচনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করতে পারে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যারা শিক্ষিত তারাই রাজনীতি নিয়ে অন্যের সাথে অধিক মাত্রায় আলোচনা করেন। যারা মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৩০ জন (২৫.৬%) এবং যারা স্নাতক বা তার উর্ধ্বে লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৯ জন (৫৮.৩%) নিয়মিত রাজনীতির বিষয় নিয়ে অন্যের সাথে আলোচনা করেন বা শুনেন । অন্যদিকে, যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে ৯১ জন (২৫.৮%), যারা প্রাইমারী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৪৭ জন (৩৮.৬%), যারা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৬৩ জন (৫৭.৫%),যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৬৩ জন (৫৩.৩৯%), এবং যারা স্নাতকোত্তর তাদের মধ্যে ১৪ জন (৪২.৪২%) উ্ত্তরদাতা মাঝে মাঝে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বা শুনেন । আর যারা কখনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না বা শুনেন না তাদের মধ্যে রয়েছেন যথাক্রমে ২৪৭ জন (৭৩.২%), ৭৪ জন (৬১.৪%),৪৪জন (৪০.০%)এবং ২৫ জন (২০.৯%) উওরদাতা । সুতরাং দেখা যায় যে, শিক্ষার সাথে রাজনৈতিক আলাচনার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০) বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৬.৩১ঃ পেশার ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের বাইরে অন্যান্যদের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনার বন্টন(%হারে)

	রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা			
পেশা	নিয়মিত	মাঝে মাঝে	না	মোট
চাকুরি	১৪	২৭	০	৪১
গৃহিনী	০	২২	২৩৪	২৫৬
ব্যবসা	১৪	৬৯	৫৬	৮৯
শ্রমিক	০	১৪	১৬	৩০
কৃষি	০	৫৫	৫৮	১১৩
ছাত্র	১৬	২৭	৩	৪৬
অন্যান্য	৮	৬৩	৭৪	১৪৫
মোট	৫২	২৭৭	৩৯০	৭২০

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, পেশার সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণের সম্পর্ক বিদ্যমান। যারা নিয়মিত অন্যান্যদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে চাকুরিজীবী ১৪ জন (৩৩.৩%), ব্যবসায়ী ১৪ জন (১৫.৬%) ছাত্র ১৬ জন (৩৫.৩%) এবং অন্যান্য ৮ জন (৫.৭%)। অন্যদিকে, যারা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যেও উল্লেখিত চার পেশার অংশগ্রহণ বেশি। সুতরাং দেখা যায় যারা আধুনিক পেশার সাথে জড়িত তাদের মধ্যে সনাতন পেশার উত্তরদাতাদের চেয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনার মাত্রা বেশি। এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল হল ০.০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী- ৬.৩২ঃ পারিবারিক আয়ের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে অন্যের সাথে আলোচনার বন্টন (% হারে)

আয়	নিয়মিত	মাঝে মাঝে	না	মোট
<২০,০০০	০৩	৩৬	২৯৯	৩৩৮
২০,০০১-৩০,০০০	০৩	৫৮	৫০	১১১
৩০,০০১-৪০,০০০	০৬	১১০	২৫	১৪১
৪০,০০১-৫০,০০০	১১	০৮	১২	৩১
৫০,০০১-৬০,০০০	০৩	১২	০৮	২৩
৬০,০০১+	২৭	৪৪	০৫	৭৬
মোট	৫৩	২৬৮	৩৯৯	৭২০

সারণী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৫৩ জন(৭.৩৬%) উত্তরদাতা রাজনীতির বিষয়ে নিয়মিত অন্যের সাথে আলোচনা করেন, ২৬৮ জন(৩৭.২২%) মাঝে মাঝে , ৩৯৯ জন (৫৫.৪২%) কখনও অন্যের সাথে আলোচনা করে না। দেখা যাচ্ছে , আয় বাড়ার সাথে সাথে অন্যের সাথে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনার হার বৃদ্ধি পায়।

৬.৩২ চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যাদের পারিবারিক আয় ২০ হাজার টাকার নিচে তাদের মধ্যে ৩ (১.৮%), যাদের আয় ২০-৩০ হাজার টাকা তাদের মধ্যে ৩ জন (১.৬%), যাদের আয় ৩০-৪০ হাজার টাকা তাদের মধ্যে ৬ জন (২.৪%), যাদের আয় ৪০.৫০ হাজার টাকা তাদের মধ্যে ১১ জন (২২.২%), যাদের আয় ৫০-৬০ হাজার টাকা তাদের মধ্যে ৩ জন (১৪.৩%) এবং যাদের আয় ৬০ হাজার টাকা আয়ের উর্ধ্বে তাদের মধ্যে ৫৩ জন (২৭.০%) উত্তরদাতা নিয়মিত অন্যান্যদের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যদিকে, মাঝে মাঝে আলোচনা করেন ২০ হাজারের নিচে আয়ের ৩৬ জন (২৩.৬%), ২০-৩০ হাজারের মধ্যে পারিবারিক আয়ের ৫৮ জন (৩৩.৩%), ৩০-৪০ হাজারের মধ্যে আয়ের ১১০ জন (৪৮.৮%), ৪০-৫০ হাজারের মধ্যে আয়ের ৮ জন (৪২.৯%) এবং ৬০ হাজার টাকার উর্ধ্বে আয়ের ৪৪ জন (৪৩.২%) উত্তরদাতা। যারা আলোচনা করেন না তাদের মধ্যে বেশির ভাগই নিম্ন আয়ের উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যায় যে, পারিবারিক আয়ের সাথে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ, অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে ব্যক্তির রাজনৈতিক ও সামাজিক আচরণ নির্ভর করে। কাইবর্গের মাধ্যমেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল= ০.০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৬.৩৩ ঃ রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার ভিত্তিতে অন্যান্যদের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনার বন্টন।

	পরিবারের বাইরে অন্যান্যদের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা			
রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা ও দেখা	নিয়মিত	মাঝে মাঝে	না	মোট
নিয়মিত	২৭	৪১	৩	৭১
মাঝে মাঝে	২৫	১৭০	৭২	২৬৭
না	০	৬৬	১৬	৩৮২
মোট	৫২	২৭৭	৩৯১	৭২০

সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, নিয়মিত রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার সাথে রাজনৈতিক আলোচনার সম্পর্ক ঘনিষ্ট। যারা নিয়মিত বা মাঝে মাঝে সংবাদ দেখেন বা শুনেন তাদের অধিকাংশই আলোচনায় অংশ নেন। বাকী উত্তরদাতাদের অধিকাংশই নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন। সুতরাং সংবাদপত্র পড়া রাজনৈতিক আলোচনাকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল =০.০০০।

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ অধ্যায়ে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে তাহলোঃ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বয়স, শিক্ষা, আয়, পেশা, নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠ, রেডিও/টিভিতে সংবাদ দেখা বা শুনার সাথে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ট। এ অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের বিষয়টি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় শিক্ষা, পারিবারিক আয়, পেশা এবং গণমাধ্যমে ব্যবহারের মাত্রা দ্বারা। গ্রামীণ জনগণ ভোট প্রদানকেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মূখ্য পদ্ধতি বলে মনে করেন । নিয়মিত-অনিয়মিত মিলে মধ্য বয়সীদের মধ্যে ভোট প্রদানের মাত্রা বেশি এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মোট ৯২% ভোটার ভোটের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নিয়মিত ও অনিয়মিত ভোট প্রদানের বিষয়টিও বিভিন্ন ডেমোগ্রাফিক চলক দ্বারা প্রভাবিত হয়। গবেষণার এ অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, ৭৯.৪% উত্তরদাতা কোনো না কোনভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত। তবে তার মধ্যে মাত্র ৫.৭% উত্তরদাতা সক্রিয়ভাবে জড়িত। বাকীরা হয় সমর্থক না হয় কোনো না কোনো দলের প্রতি সহানুভুতিশীল। গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রতি তাদের উদাসীনতা রয়েছে। পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য নাগরিকদের সাথে রাজনীতির বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের মধ্যে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। মাত্র ১.৯% উত্তরদাতা নিয়মিত এবং ৯.৫% ভাগ উত্তরদাতা মাঝে মাঝে পরিবারের

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের সাথে রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আর বাকী ৮৮.৫% উত্তরদাতা কখনো তা করেন না। অন্যদিকে, অন্যান্যদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করেন মাত্র ৭.৩% উত্তরদাতা এবং মাঝে মাঝে ৩৪.৫% উত্তরদাতা,যেখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ একেবারেই সীমিত। রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণের বিষয়টি বিভিন্ন ডেমোগ্রাফিক চলক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার মধ্যে শিক্ষা, আয় এবং গণমাধ্যম অন্যতম। সুতরাং দেখা যায়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি অন্যতম বিষয় ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের অংশগ্রহণ আশানুরূপ। কিন্তু রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা এবং সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক আলোচনার প্রতি গ্রামীণ জনগণের সাড়া প্রদানের মাত্রা আশাব্যঞ্জক নয়। এর প্রতি তাদের কিছুটা উদাসীনতা প্রমাণিত হয়। কারণ, তারা মনে করেন রাজনীতি রাজনীতিই, তা নিয়ে আলোচনা করা তাদের কাজ না।

প্রার্থী নির্বাচনে ভোটারগণ প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাবলী যেমন শিক্ষাগত যোগ্যতা, নাগরিক সংশ্লিষ্টতা, নেতৃত্বদানের গুণাবলী , সততা প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। কারণ , জাতীয় নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করেন। ভোট সংক্রান্ত আচরণে দেখা যায় , উপরোক্ত সব গুণাগুণ থাকার পরও একজন প্রার্থী অনেক সময় জয়ী হতে ব্যর্থ হন। বিজয়ী প্রার্থী হয়তো এত গুণের অধিকারী নন। আর তাই দেখা যাচ্ছে যে প্রার্থীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ তার নির্বাচিত হওয়ার একমাত্র মানদণ্ড নয় । বস্তুতঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দলের সার্বিক একাত্মতা , প্রচার , জাতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোকে প্রার্থী নিজ দল যদি সফলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাহলে ভোটারদের কাছে প্রার্থীর গুণাবলীর চেয়ে দল বড় হয়ে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ অধ্যায়

তথ্য নির্দেশিকা

১। Clotfelter, James, Charles L. Prysby, Political Choices: A Study of Elections and Voter, Newyork: Library of Congress, 1980.,p-50

২. Ball,Alan R., Modern Politics and Government,London: The McMillan Press,Ltd., 1977.

৩. Brennan, Geofrey And Loren Lomasky, Democracy and Decision: The Pure Theory of Electoral Preference, London: Cambridge University Press, 1997,P-1.

৪.Converse, Philip E., Georges Dupeux, "De Gulle and Eisen Hower: The Public Image of the Victorious General," in Elections and the Political Order , P-152.

৫.Lipset, Seymour Martin, The Encyclopedia of Democracy, Vol.111, Roulledge, London,1995, P.913-914.

৬.Eldersveld, H. Eulau, S.J. & Janowitz, M.(ed), Political Behaviour : A reader in Theory and Research, Amerind Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi,1972, p.133.

৭.Dahl, Robert A. Modern Political Analysis, Prentice Hall, Inc 1963,P.55.

৮.Almond, Gabrial & Sedney Verba, The Civic Culture, Princeton, N.J.,Pr\inceton University Press,1963.

৯.W.L.Miller, "Political Participation And Voling Behaviour"in Hawekesworth Mary & Maurice Kogan (ed.), Encyclopedia of Government & Politics, London,1992,p.433

১০.Lipset, Seymour Martin, Ibid,Vol.111, P.913-914.

এ অধ্যায় অনালোচিত ডেমোগ্রাফিক উপাদানগুলোর ও কাইবর্গের মাধ্যমে পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে কিন্তু সেগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ কোন সম্পর্ক পরিলক্ষিত না হওয়ায় বিশ্লেষণ করা হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ক্ষমতার পরিবর্তন/ ক্ষমতার শান্তি পূর্ণ হস্তান্তর পদ্ধতি

৭.১ বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতির সংস্কৃতি

৭.২ সরকার পরিবর্তন /ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সমূহ (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়)ঃ

ক. গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

খ. অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

গ. রাজনৈতিক বিশ্বাস

ঘ. সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে নির্দিষ্ট সময়ের সরকার জনগণ কর্তৃক মনোনীত হন। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে জনগণ আবার পরবর্তী মেয়াদের জন্য সরকার নির্বাচিত করে। বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির ধারা পর্যালোচনার মাধ্যমে এ দেশে সরকার পরিবর্তন /ক্ষমতার হস্তান্তরের ধারাবহিকতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। আর তাই এ অধ্যায়ের শুরুতেই বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতির সংস্কৃতি ও পরবর্তীতে তার বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এরপর সরকার পরিবর্তন ক্ষমতার/ শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত ও সমাধানের উপায় বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হবে।

৭.১ বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতির সংস্কৃতি

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমেই ভোটারগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করে থাকেন। বস্তুতঃ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে নির্বাচনই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।[১] তাছাড়া গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বের জন্যেও দরকার যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন।[২] নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের পছন্দ অনুযায়ী একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নেতা বা প্রতিনিধি বাছাই করে থাকে । বস্তুতঃ ক্ষমতার বৈধকরণ ও হাতবদলের উপযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এই পদ্ধতির দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ নিজেকে রাজনৈতিক সমাজের গুরুত্বপুর্ণ অংশ হিসেবে ভাবতে শিখে। নির্বাচন হচ্ছে জাতীয় সংহতির সহায়ক।[৩]

আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ হলো নির্বাচন। নির্বাচনের উপযুক্ত পরিবেশ ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না। গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন । জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে , বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র। এই প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমাজে হঠাৎ করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। স্বৈরাচার অবসান এবং গণতন্ত্রের বিকাশ লাভের মাধ্যমে যেমন নির্বাচন ও নির্বাচক মন্ডলীর গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে, তেমনি প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থাও বিভিন্ন বিবর্তনের পথ ধরে বর্তমান স্তরে এসে উপনীত হয়েছে। সাধারণত ঃ মনে করা হয় যে,মধ্যযুগে প্রতিনিধির সূত্রপাত হয়।সে যুগে বিভিন্ন নামে এই ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট , ফ্রান্সের এস্টেটস্ জেনারেল, স্পেনে করটেস , জার্মানীতে ডায়েট ইত্যাদি প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু উল্লেখিত দেশগুলোর আইনসভা সে সময়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত ছিল না। কিছু সংখ্যক অভিজাত শ্রেণী শাসন ব্যবস্থার সকল কিছু নির্ধারণ করতেন। বৃটেনের আইনসভার সদস্যগণ ছিলেন রাজা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি। প্রকৃত অর্থে তারা জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেননা এবং জনসাধারণের প্রতি কোন দায়দায়িত্ব ছিল না । ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের পর প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্ট প্রাধান্য লাভ করে। তারপরই যে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছে তা বলা যায় না। তবে উক্ত বিপ্লবের পর রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে গণতান্ত্রিক শাসনের যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৮২৮ , ১৮৩২, ১৯৩২ সালের সংস্কার আইন বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূত্রপাত এবং প্রতিনিধিত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪] প্রাচীন গ্রীস বা এথেন্সেও নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে স্থাপিত হয়েছে জাতীয় রাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্র বিশাল এলাকা ও বিরাট জনসমন্বয়ে গঠিত হওয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের পক্ষে সরকার পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সম্ভব নয়। কাজেই প্রাচীন কালের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন বর্তমানে অচল । আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার জনগণের সার্বভৌমত্ব নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত হয়। বর্তমানে জনগণ প্রধানত ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার করে থাকে এবং প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে।[৫] কাজেই বাংলাদেশে বর্তমানে যে নির্বাচন ও নির্বাচনী রাজনীতি তা দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবনের ফলস্বরূপ।

৭.২ঃ ব্রিটিশ ভারতে নির্বাচনী রাজনীতি

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ দখল করার পূর্বে এদেশে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল এবং রাজাদের মনে করা হত ঈশ্বরের প্রতিনিধি । রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল" পরিষদ " নামে পরিচিত রাজার মন্ত্রীমন্ডলীর উপর। রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে পরিষদের সদস্য হতেন শুধু যোদ্ধা ও যাজক সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিরা । তারা যথাসাধ্য নিজের বিশেষ সুযোগ সুবিধার অধিকার রক্ষা করে চলতেন এবং সীমাবদ্ধ করে রাখতেন রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা।[৬] ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর ভারতবর্ষে শুরু হয় ব্রিটিশ শাসন । প্রথম দিকে ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করা । কিন্তু পরবর্তীতে তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধীরে ধীরে এদেশের শাসন ব্যবস্থায় সবকিছু নিয়ন্ত্রন করা শুরু করে। শাসন ব্যবস্থার মূল পদগুলোতে ব্রিটিশদের নিয়োগ দেয়া হতো। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের প্রতি শোষণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকলে ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিবাদ করার মানসিকতা গড়ে উঠতে থাকে । যার ফলস্বরূপ দেখা দেয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ । এ সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়ে নেয় ব্রিটিশ সরকার এবং তারা অনুভব করে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ভারতীয় জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সে লক্ষ্যেই তারা বিভিন্ন ধরণের আইন প্রনয়ন করতে শুরু করে। এই আইনগুলোর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করে। এর ফলে ভারতবর্ষে নির্বাচন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয় ।[৭]

ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন পর্যায়ে বহুবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯০৯ সালের আইন (মর্লি-মিন্টো সংস্কার) নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করে এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন পদ্ধতি চালু হয়। ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন দ্বারা এই উপমহাদেশে প্রথম পার্লামেন্টারি দায়িত্বশীল স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয়। এ সময় নির্বাচক মন্ডলীর প্রতিনিধিদের হাতে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।[৮]

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে গভর্নর জেনারেল ও দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা গঠন করা হয়। উচ্চ পরিষদের নাম রাষ্ট্রীয় সভা ও নিম্ন পরিষদের নাম যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা । উচ্চ পরিষদের ২৬০ জন সদস্যের মধ্যে ১৫০ জন পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচিত হতো। আইনসভার নিম্ন পরিষদের ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৫০ জন প্রাদেশিক আইন পরিষদ দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতো ।[৯]

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলে নির্বাচনী রাজনীতি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের কাছে থেকে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের এক উপনির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতাশীল মুসলিম লীগ দল নানা অজুহাতে ও আইনের মারপ্যাঁচের মাধ্যমে নির্বাচন এড়িয়ে চলেন। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ৮ ই মার্চ সাবেক পূর্ববাংলায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক , হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ২১ দফার ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এই যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনে সর্বমোট ৩০৯ টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু নির্বাচনের এই ফলাফলকে উপেক্ষা করা হয় ।[১০] ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে। আইয়ুব খান ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ (**Basic Democracy Order**) অনুসারে মৌলিক গণতন্ত্র নামে নতুন ধরণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করেন। এতে পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার কথা বলা হয়। ১৯৬০ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারী ইউনিয়ন কাউন্সিল , ইউনিয়ন কমিটি ও টাউন কমিটির ৮০,০০০ মৌলিক গণতন্ত্রীর শতকরা ৯৫.৬২ টি আস্থা ভোট পেয়ে জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। [১১] মৌলিক গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রফেসর এ. মাজেদ খানের উক্তি , " **It is neither basic nor democracy** ".১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগের জন্য পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অব্যাহত থাকে।[১২]

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬-দফা ঘোষণা করেন। এই ৬ দফা দাবী আদায়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পূর্ব - পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকে । পূর্ব - পাকিস্তানের জনগণের আন্দোলনের মুখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালের ২৫ শে মার্চ সারা পাকিস্তানে দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক আইন জারি করেন। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুসারে, ১৯৭০ সালের অক্টোবরে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন এবং প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানী শাসকরা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে। এমনকি তারা ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতের অন্ধকারে নিরীহ বাঙালী জনগণের উপর গণহত্যা শুরু করে। যে কারণে বাঙালী জনগণ পশ্চিম-পাকিস্তানীদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। [১৩]

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নির্বাচনী রাজনীতি

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৮টি সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সর্বমোট ১৪টি প্রধান রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে এবং ভোটার সংখ্যা ছিল ৩,৫২,০৫,৬৪২।[১৪] এই নির্বচনে জাতীয় সংসদের ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে ১১টি আসনে একজন করে প্রার্থী থাকায় এবং তাদের মনোনয়ন বৈধ বিবেচিত হওয়ায় তারা সবাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। অবশিষ্ট ২৮৯ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৩ এর জাতীয় নির্বাচনে প্রায় ৫৫% ভোটার ভোট প্রদান করে।[১৫]

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের মাধ্যমে যে সামরিক আইন জারি করা হয় ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে।[১৬] ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩,৮৩,৬৩,৮৫৮ জন। এই নির্বাচনে মোট ২৯ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে । এর মধ্যে ১৮টি দল কোন আসন লাভ করতে পারেনি। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জয়লাভ করে।[১৭]

১৯৮৬ সালের ৭ই মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এই নির্বাচনে বিরোধী জোটসমূহের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে শুধু ৮ দলীয় জোট ও জামায়েত ইসলাম অংশগ্রহণ করে। সামরিক সরকার পরিচালিত এই নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। ১৯৮৬ সালের এই নির্বাচনে ১,৫২৭ জন প্রার্থী, ২৮ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে এবং ভোটার সংখ্যা ছিল ৪,৭৩,২৫,৮৮৬ জন । এই নির্বাচনে মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে জেনারেল এরশাদ সমর্থিত জাতীয় পার্টি ১৫৩টি আসন পেয়ে সর্বাধিক আসনে জয়লাভ করে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী এরশাদ একটি অবৈধ নির্বাচনকে বৈধ করে নেন।[১৮]

১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় সংসদের চতুর্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিরোধী দলীয় জোট ৮,৭,৫এবং জামায়েত ইসলাম অংশগ্রহণ করেনি।এই নির্বাচনে খুব কম সংখ্যক ভোটার অংশ নেয় । বিদেশী সাংবাদিকদের মতে অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রই জনশূণ্য ছিল।এই নির্বচনে মোট প্রার্থী ছিল ৯৮৪ জন এবং ৩০০ টি আসনের মধ্যে জাতীয় পার্টি ২৫১ টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে।[১৯]

১৯৯১ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মত বাংলাদেশে একটি অস্থায়ী নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে মোট ৭৫ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করে। এতে ভোটার সংখ্যা ছিল ৬,২২,৮৯,৫৫৬ । এই নির্বাচন এদেশের জাতীয় জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ ঘটনা । এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪২ টি আসন পেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিল ২,৭৭৪ জন। [২০]

১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী বিরোধী দল সমূহের চরম বিরোধীতা , নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের মধ্যেও গণ কার্ফ্যু কড়া পাহারা এবং ভীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটকেন্দ্র গুলোতে ভোটারদের প্রকৃত উপস্থিতি শতকরা পাঁচ ভাগের বেশি ছিল না। এই সংসদে সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা আসনসহ ৩৩০টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের আসন সংখ্যা ছিল ৩০৮টি। বিদেশী পর্যবেক্ষকেরা এই নির্বাচন সম্পর্কে বলেন যে, বিশ্বের কোথাও তারা এমন নির্বাচন দেখেননি। [২১]

১৯৯৬ সালের ১২ই জুন ২য় বারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[২২] এই নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দল ও ২,৫৭৪ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। নির্বাচন কমিশনের হিসাব অনুযায়ী মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫,৬৭,১৬,৯৩৫ জন। এই নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪৬টি আসন পেয়ে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ জয়লাভ করে এবং প্রধান বিরোধীদল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল , জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশ পায় যথাক্রমে ১১৬ , ৩২ এবং ৩টি আসন।[২৩] পর্যবেক্ষকদের মতে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। [২৪]

২০০১ সালের পহেলা অক্টোবর বাংলাদেশে তৃতীয় বারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিগত সরকারের পরিপূর্ণ মেয়াদ পূরণের প্রেক্ষাপটে এই নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় এক নতুন মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়।[২৫] এই নির্বাচনে মোট ৯৫টি রাজনৈতিক দল ও ১৯৩০ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনের একটি উলেখযোগ্য অংশ হচ্ছে চারদলীয় ঐক্যজোট। ৩০০টি আসনের মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বে চারদলীয় ঐক্যজোট ২১৬ টি আসনে জয়লাভের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এর মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এককভাবে পায় ১৯৩টি আসন। জামায়েত ইসলাম ১৭টি , জাতীয় পার্টি(না-ফি) ৪টি, ইসলামি ঐক্যজোট ২টি করে আসন লাভ করে। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ৬২টি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ১৪টি, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) ১টি, কৃষক-শ্রমিক লীগ ১টি, এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৬টি আসনে জয়লাভ করে।[২৮] বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোটারের অংশগ্রহণ এবং অবাধ , সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতার জন্য দেশে - বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। অগণিত দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনের ব্যাপারে তাদের ইতিবাচক মন্তব্য নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।[২৯] তবে প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধী দল আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে সুক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ করে । যে কারণে তারা এখন পর্যন্ত সংসদে আসেনি।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত মোট আটটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তালিকা নিম্নে সারণী ৭.১ এ উপস্থাপন করা হলো। [৩০]

সারণী ৭.১ঃ

নম্বর	সাল	মোট প্রার্থী	মোট ভোটার	মোট রাজনৈতিক দল
০১	৭ই মার্চ ১৯৭৩	১০৮৯	৩,৫২,০৫,৬৪২	১৪
০২	১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯	২১২৫	৩,৮৩,৬৩,৮৫৮	২৯
০৩	৭ই মে ১৯৮৬	১৫২৭	৪,৭৩,২৫,৮৮৬,	২৮
০৪	৩রা মার্চ ১৯৮৮	৯৭৮	৪,৯৮,৬৩,৪২৯	৮
০৫	২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১	২৭৭৪	৬,২২,৮৯,৫৫৬	৭৫
০৬	১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬	১৮৭৬	৫,৬১,৬৩,২৯৬	---
০৭	১২ই জুন ১৯৯৬	২৫৭৪	৫,৬৭,১৬,৯৩৫	৮১(১১৯)
০৮	১লা অক্টোবর ২০০১	১৯৩০	৭,৪৭,০৯,৬৭৮	৯৫

বাংলাদেশের বর্তমান যে নির্বাচন ব্যবস্থা তা ব্রিটিশদের দ্বারা প্রণীত নির্বাচন ব্যবস্থার অনুরূপ। তবে ব্রিটিশ আমলে সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত ছিল না। পাকিস্তান আমলেও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও ১৯৭০ সালে যে জাতীয় নির্বাচন অনষ্ঠিত হয় তা মূলতঃ কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাস্তবে এসব নির্বাচনের ফলাফল কার্যকর হয়নি। [৩১] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে প্রথম এবং ১৯৭৯ সালে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। তবে এসব নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়েও বিতর্ক আছে। পরবর্তীতে ১৯৮৬,১৯৮৮ এবং ১৯৯৬(১৫ই ফেব্রুয়ারী) সালে যথাক্রমে যে তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনষ্ঠিত হয়, সে নির্বাচনগুলোও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি। এই নির্বাচনগুলোতে ভোটকেন্দ্র দখল , ব্যালট বাক্স ছিনতাই ইত্যাদি নানারকম নির্বাচনী অনিয়ম ঘটেছে। এ নির্বাচনগুলোতে জনগণের স্বতস্ফূর্তঃ অংশগ্রহণ ছিলনা। এ নির্বাচনগুলো দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকদের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। তবে নির্দলীয় , নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯১,১৯৯৬(১২ই জুন)এবং সর্বশেষ ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন অপেক্ষাকৃত অবাধ , সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এ নির্বাচনগুলোতে নারী - পুরুষ নির্বিশেষে সকল স্তরের জনগণের স্বতস্ফূর্তঃ অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৭.২ সরকার পরিবর্তন / ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের গুরুত্বপুর্ণ উপাদান সমূহঃ

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নির্বাচন। নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তিত হয়ে থাকে । এই সরকার পরিবর্তন/ ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। বর্তমান গবেষণায় এ অধ্যায়ে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য যে উপদেশগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সেগুলো হলোঃ

ক. গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

খ. অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি গুরুত্ব

গ. রাজনৈতিক বিশ্বাস

ঘ. সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐকমত্য।

৭.৩ ক. গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হলো মনোজাগতিক ও পূর্ব ধারণামূলক তবে রাজনৈতিক আচরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিমাপ করা সম্ভব। মানুষের রাজনৈতিক আচরণে যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসৃত রীতি-নীতিগুলো স্থান পায় তবে ধরে নেয়া হয় যে, তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও এর প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস আছে। রীতি-নীতিগুলোকে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন । Robert Dahl বলেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিভিন্ন শর্ত ও রীতিনীতির প্রতি নাগরিদেরকে আনুগত্য পোষণ করতে হয়, যেসব শর্তকে গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত বলে অভিহিত করা হয়। এসব শর্তের মধ্যে আছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ , আইনের শাসন , স্বাধীনতা ও সাম্য ইত্যাদি।[৩২] বর্তমান গবেষণায় গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের যে বিষয়গুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে সেগুলো হলঃ

১। নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি গ্রামীণ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস

২। আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

৩। হরতাল ও ধর্মঘটের প্রতি মনোভাব

৭.৩.ক. ১। নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি গ্রামীণ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস

নির্বাচন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক শর্ত । গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজন যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলোর মধ্যে নির্বাচনই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। [৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্রে নির্বাচনকে ক্ষমতা পরিবর্তনের বৈধ উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্রকে যদি পদ্ধতিগত দিকে থেকে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তাহলে নির্বাচনকে গণতন্ত্রের একমাত্র উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয় । [৩৪] হান্টিংটন মন্তব্য করেছেন, " নির্বাচন গণতন্ত্রের জীবনই কেবল নয় , বরং তা স্বৈরতন্ত্রের মৃত্যুও"। [৩৫] কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ এ নির্বাচন ব্যবস্থাকে কিভাবে দেখে তা জানার জন্য গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদেরকে একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তা হল ঃ নির্বাচন ব্যবস্থাকে আপনি কিভাবে দেখেন?

যেহেতু আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর প্রায় সকল উত্তরদাতাই নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় মনে করেছেন এবং যেহেতু বিশেষ কোনো চলকের আলাদা তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায় না । তাই গ্রামীণ জনগণের নির্বাচন ব্যবস্থাকে মূল্যায়নের বিষয়টির একটি মাত্র সারণি এখানে উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি - ৭.২ শিক্ষার ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের বন্টন।

নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস			
শিক্ষা	প্রয়োজন আছে	প্রয়োজন নেই	মোট
নিরক্ষর	৩৩০	৭	৩৩৭
প্রাইমারী	১৩০	০	১৩০
নিম্ন মাধ্যমিক	৯৮	০	৯৮
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১১৯	০	১১৯
স্নাতক +	৩৩	০	৩৬
মোট	৭১৩	৭	৭২০

সারণি ৭.২ এ দেখা যাচ্ছে , ৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭১৩ জন(৯৮.৯%) উত্তরদাতাই নির্বাচনের প্রয়োজন আছে বলে মতামত প্রদান করেছেন। বাকী ৭ জন (১.১%) উত্তরদাতা নেতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে , বাংলদেশের গ্রামীণ জনগণ নির্বাচনকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করেন এবং নির্বাচন থাকা প্রয়োজন সে বিষয়ে তাদের বিশ্বাস প্রবল। তবে গ্রামীণ জনগণের মাঝে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে পারলে নির্বাচনের গুরুত্বের বিষয়টি আরও জোড়ালোভাবে তাদের কাছে গ্রহণীয় হবে।

৭.৩ ক.২. আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস

আইনের শাসন হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অন্যতম একটি পূর্বশর্ত । আইনের শাসন বলতে বোঝায় আইনের পূর্ণ প্রাধান্য এবং আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং সকলের সমান অধিকার । বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ এ বিষয়ে কি

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বাস পোষণ করেন এবং আইনের শাসনের প্রতি তাদের আস্থা আছে কিনা তা জানার লক্ষ্যে গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের সবার নিকট প্রশ্ন রাখা হয়েছিল ঃ আইনের শাসনকে আপনি কিভাবে দেখেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাগণ কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যের ভিত্তিতে আইনের শাসনের প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাসের বিষয়টি নিম্নে সারণি ও চিত্রে বিশ্লেষণ করা হল ঃ

সারণি ঃ ৭.৩ঃ শিক্ষার ভিত্তিতে আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের বন্টন ।

	আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস			
শিক্ষা	অবশ্যই প্রয়োজন আছে	প্রয়োজন আছে	জানি না	মোট
নিরক্ষর	৩৮	২৯৭	৩	৩৩৪
প্রাইমারী	৮	১১৩	০	১৩০
নিম্ন মাধ্যমিক	৩৮	৬৩	০	৯৮
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	৮৫	৩৩	০	১২০
স্নাতক +	৩০	২	০	৩৮
মোট	২০৯	৫০৮	৩	৭২০

সারণি ৭.৩ থেকে দেখা যায় যে, ৭২০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২০৯ জন(২৯.০%) উত্তরদাতা 'অবশ্যই আইনের শাসন প্রয়োজন ' বলে বিশ্বাস করেন । ৫০৮ জন(৭০.৬%) উত্তরদাতা ' প্রয়োজন আছে' বলে মনে করেন এবং মত প্রকাশ করেছেন। মাত্র ৩ জন(০.৪%) জানিনা বলে উত্তর প্রদান করেছেন। নিরক্ষরদের মধ্যে ৩৮ জন(১১.৪%), প্রাইমারী পর্যন্ত যারা পড়ালেখা করেছেন তাদের মধ্যে ৮ জন(৭%), নিম্নমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন তাদের মধ্যে ৩৮ জন,(৪৩%), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে৮৫ জন(৭২%) এবং স্নাতক বা তার উর্ধ্বে যারা লেখাপড়া করেছেন পড়েছেন তাদের মধ্যে ৩০জন(৯১.৭%) উত্তরদাতা অবশ্যই আইনের শাসন প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। অন্যদিকে নিরক্ষরদের মধ্যে ২৯৭ জন(৮৭.৮%) , প্রাইমারী পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১১৩ জন(৯৩.২%) , নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৬৩জন(৫৭.৫%),মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৩৩জন(২৭.৯%)এবং স্নাতক বা তার উর্ধ্বে যারা লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ২জন(৮.৩%) উত্তরদাতা আইনের শাসন প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছেন । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার সাথে আইনের শাসনকে ইতিবাচকভাবে মূল্যায়নের সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত গভীর । যারা অপেক্ষাকৃত বেশি শিক্ষিত তারা আইনের শাসন অবশ্যই প্রয়োজন বলে মনে করেছেন এবং যারা অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত তারা আইনের শাসন প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছেন। কাজেই বলা যায় যে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলে আইনের শাসনের প্রতি গ্রামীণ জনগণের আস্থা , বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাশীলতার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে । কাইবর্গের মাধ্যমেও বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল =০.০০০ যা শিক্ষার সাথে আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

চিত্র ৭.৪ পেশার ভিত্তিতে আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের বন্টন।

	আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস			
পেশা	অবশ্যই প্রয়োজন আছে	প্রয়োজন আছে	জানি না	মোট
চাকুরি	৩৩	০৮	০০	৪১
গৃহিনী	৩০	২২৩	০০	২৫৩
ব্যবসা	৪১	৪৭	০০	৮৮
শ্রমিক	০৮	২২	০০	৩০
কৃষি	২২	৯১	০০	১১৩
ছাত্র	৩৬	১১	০০	৪৭
অন্যান্য	৩৮	১১০	০০	১৪৮
মোট	২০৮	৫১২	০০	৭২০

চিত্র ৭.৪ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পেশার সাথে আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর । যারা ছাত্র , চাকরি ও ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের মধ্যে আইনের শাসন অবশ্যই প্রয়োজন আছে বলে মনে করার প্রবণতা বেশি । অন্যদিকে , যারা সনাতন পেশার সাথে যুক্ত তাদের মধ্যে আইনের শাসন আছে বলে মনে করার প্রবণতা বেশি । চাকুরিজীবীদের মধ্যে৩৩ জন(৮০%) , গৃহিনীদের মধ্যে ৩০ জন(১১.৮%) , ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৪১ জন(৪৬.৯%), শ্রমিকদের মধ্যে ৮ জন(২৭.৩%), কৃষিজীবীদের মধ্যে ২২ জন(১৯.৫%), ছাত্রদের মধ্যে ৩৬ জন(৭৬.৫%) এবং অন্যান্যদের মধ্যে ৩৮ জন(২৬.৪%) উত্তরদাতা আইনের শাসন অবশ্যই প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। অন্যদিকে , আইনের শাসনকে প্রয়োজন মনে করেছেন যথাক্রমে চাকুরিজীবীদের মধ্যে ৮ জন(২০%),

Dhaka University Institutional Repository

গৃহিনীদের মধ্যে ২২৩ জন(৮৭.১%), ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৪৭ জন(৫৩.১%), শ্রমিকদের মধ্যে ২২ জন(৭২.৭%), কৃষিজীবীদের মধ্যে ৯১ জন(৮০.৫%), ছাত্রদের মধ্যে ১১ জন(২৩.৫%) এবং অন্যান্যদের মধ্যে ১১০ জন(৭৩.৬%) উত্তরদাতা । কাজেই দেখা যায় যে, যারা আধুনিক পেশার সাথে জড়িত তারা আইনের শাসনকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন আর যারা গতানুগতিক পেশার সাথে জড়িত তারা প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। কাইবর্গের মাধ্যমেও বিষয়টি প্রতীয়মান হয় । এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল =০.০০০।

সারণি ৭.৫ রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার ভিত্তিতে আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের বন্টন।

	আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস			
রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখা	অবশ্যই প্রয়োজন আছে	প্রয়োজন আছে	জানি না	মোট
নিয়মিত	৬৩	৮	০	৭১
মাঝে মাঝে	১১৬	১৫১	০	২৬৭
না	৩০	৩৪৯	৩	৩৮২
মোট	২০৯	৫০৮	৩	৭২০

সারণি ৭.৫ থেকে দেখা যায় যে, যারা নিয়মিত রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে ৬৩ জন(৮৮.৫%), যারা মাঝে মাঝে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে ১১৬ জন(৪৩.৩%), এবং যারা সংবাদ শুনেন না বা দেখেন না তাদের মধ্যে ৩০ জন(৭.৯%) উত্তরদাতা অবশ্যই আইনের শাসনের প্রয়োজন আছে বলে উত্তর প্রদান করেছেন। অন্যদিকে , যারা নিয়মিত রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে ৮জন(১১.৫%), যারা মাঝে মাঝে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে ১৫১জন(৫৬.৭%) এবং যারা সংবাদ শুনেন না কিংবা দেখেন না তাদের মধ্যে ৩৪৯জন(৯১.৪%) উত্তরদাতা আইনের শাসন প্রয়োজন বলে মনে করেছেন। তাহলে দেখা যায় যে,আইনের শাসনকে মুল্যায়নের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সাথে বিশেষ সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০) আছে। কারণ , যারা রেডিও / টিভিতে নিয়মিত কিংবা মাঝে মাঝে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে আইনের শাসন সংক্রান্ত জ্ঞান বিকশিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া অন্যান্য চলকের (বয়স,আয়) সাথে আইনের শাসনের বিষয়টি মূল্যায়নের তেমন কোনো সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়নি বলে গবেষণায় তা উলেখ করা হয়নি।

৭.৩.ক.৩. হরতাল ও ধর্মঘটের প্রতি মনোভাব ঃ

গণতন্ত্রে প্রতিবাদের ভাষা হচ্ছে হরতাল বা ধর্মঘট। এটিকে নন- কনভেনশনাল ওয়েও বলা চলে। ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণ ধর্মঘট বা হরতালের সঙ্গে প্রাচীন কাল থেকেই কম বেশি পরিচিত হলেও হরতাল বা ধর্মঘটের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটে বৃটিশ আমলে। বৃটিশদের অত্যাচারের প্রতিবাদে উপমহাদেশের জনগণ হরতাল ও ধর্মঘট করতে বাধ্য হয় । এর মাধ্যমে সরকারের কোনো সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ কম বেশি হরতাল বা ধর্মঘটের সাথে পরিচিত। বাংলাদেশে গত এক দশকে এর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।[৩৬] বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণ হরতাল বা ধর্মঘটের বিষয়টিকে কিভাবে দেখে তা জানার জন্য গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের নিকট একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তা হল ঃ হরতাল বা ধর্মঘটকে আপনি কিভাবে দেখেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রামীণ জনগণ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা নিম্নে সারণি ও চিত্রে উপস্থাপন করা হল ঃ

সারণি ৭.৬ঃ শিক্ষার ভিত্তিতে হরতাল ও ধর্মঘটের প্রতি মনোভাবের বন্টন।

	হরতাল ও ধর্মঘটের প্রতি মনোভাব				
শিক্ষা	সমর্থন করি	সমর্থন করি না	কিছুটা সমর্থন করি	জানি না	মোট
নিরক্ষর	৩	৩১৬	০	১৯	৩৩৮
প্রাইমারী	০	১১৮	৩	০	১২১
নিম্ন মাধ্যমিক	৫	৯৬	৮	০	১০৯
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	০	৭৭	৪১	০	১১৮
স্নাতক +	০	১৭	১৭	০	৩৪
মোট	৮	৬২৪	৬৯	১৯	৭২০

সারণি ৭.৬ থেকে দেখা যায় যে, ৭২০জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৮ জন(১.১%) উত্তরদাতা হরতাল ও ধর্মঘট সমর্থন করেন , ৬২৪জন(৮৬.৬%) উত্তর দাতা হরতাল ও ধর্মঘটকে সমর্থন করেন না ,৬৯ জন(৯.৫%) উত্তরদাতা কিছুটা সমর্থন করেন এবং ১৯জন উত্তরদাতা "জানি না "বলে উত্তর দান করেছেন। যে ৩ জন উত্তরদাতা হরতাল ও ধর্মঘটকে সমর্থন করেন বলে উত্তর প্রদান করেছেন তার মধ্যে ৩ জন নিরক্ষর এবং ৫ জন নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত

Dhaka University Institutional Repository

লেখাপড়া করেছেন। অন্যদিকে , যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে৩১৬ জন(৯৩.৫%) , যারা প্রাইমারী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে১১৮ জন(৯৩.৭%), যারা নিম্নমাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৯৬ জন(৮৭.৫%), যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৭৭ জন(৬৫.১%), যারা স্নাতক বা তার উর্ধ্বে লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৭ জন(৫০%) উত্তরদাতা হরতাল ও ধর্মঘটকে সমর্থন করেন না। হরতাল ও ধর্মঘটকে কিছুটা সমর্থন করেন বলে উত্তর প্রদান করেছেন যারা প্রইমারী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৩ জন(২.৩%), যারা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৮ জন(৭.৫%), যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৪১ জন(৩৪.৯%) এবং যারা স্নাতক বা তার উর্ধ্বে লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৭জন(৫০%) উত্তরদাতা । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার সাথে হরতাল ও ধর্মঘটকে সমর্থন করা বা না করার গভীর সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০) লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে হরতাল ও ধর্মঘটকে সমর্থনের মাত্রাও বাড়ছে। এর কারণ হল , শিক্ষিত মানুষ অতি মাত্রায় অধিকার সচেতন। তাই অধিকার আদায় বা প্রতিবাদের একটি মাধ্যম হিসেবে তারা হরতাল বা ধর্মঘটকে কিছুটা সমর্থন করেন। আর যারা নিরক্ষর তারা ধর্মঘটকে তেমন সমর্থন করেন না।

চিত্র ৭.৭ পেশার ভিত্তিতে হরতাল ও ধর্মঘটের প্রতি মনোভাবের বন্টন (%হারে)।

	আইনের শাসনের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস			
পেশা	হ্যাঁ	না	কিছুটা সমর্থন	মোট
চাকুরি	০০	৩০	১১	৪১
গৃহিনী	০০	২৩৪	০৩	২৩৭
ব্যবসা	০৩	৬৩	২২	৮৮
শ্রমিক	০০	৩০	২২	৫২
কৃষি	০৩	১১০	০৯	১২২
ছাত্র	০০	২৫	০৯	৩৪
অন্যান্য	০৩	১৩২	১১	১৪৬
মোট	০৯	৬২৪	৮৭	৭২০

চিত্র ৭.৭ থেকে দেখা যায় যে, পেশার সাথে হরতাল ও ধর্মঘটকে সমর্থন করা বা না করার সম্পর্ক বিদ্যমান । যারা হরতাল ও ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন তাদের মধ্যে আছেন ব্যবসায়ী ৩ জন(৩.১%),কৃষিজীবি ৩ জন(২.৪%) এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ৩ জন (১.৯%)উত্তরদাতা। অন্যদিকে , চাকুরিজীবীদের মধ্যে ৩০ জন(৭৩.৩%),গৃহিণীদের মধ্যে ২৩৪ জন(৯১.৪%), ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৬৩ জন(৭১.৯%), শ্রমিকদের মধ্যে ৩০

Dhaka University Institutional Repository

জন(১০০%), কৃষিজীবীদের মধ্যে১১০ জন(৯৭.৬%), ছাত্রদের মধ্যে ২৫ জন(৫২.৯%) এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিতদের মধ্যে ১৩২ জন(৯০.৬%) উত্তরদাতা হরতাল ও ধর্মঘটকে সমর্থন করেননা। কিছুটা সমর্থন করেছেন যারা তাদের মধ্যে রয়েছেন চাকরিজীবী ১১ জন(২৬.৭%), গৃহিণী ৩ জন(১.১%), ব্যবসায়ী ২২ জন(২৫%), ছাত্র ২২ জন(৪৭.১%) এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিতদের মধ্যে ১১জন(৭.৫%) উত্তরদাতা। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, পেশার সাথে হরতাল ও ধর্মঘটকে মূল্যায়নের সম্পর্ক (কাই বর্গের ফলাফল=০.০০০) অত্যন্ত ঘনিষ্ট।

৭.খ. অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি গুরুত্ব

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা । একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুণটি বিকশিত হতে হয়। ব্যক্তির সজ্ঞান উদ্যোগে এমনি ধরণের ঐতিহ্য সৃষ্টি হলে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়। [৩৭] বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের মধ্যে অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি পরিমাপের জন্য গবেষণা এলাকার নমুনায় অন্তর্ভূক্ত উত্তরদাতাদের সবার কাছেই একটি সাধারণ প্রশ্ন রাখা হয় তা হল ঃ আপনি কি অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন? এ প্রশ্নের উত্তরে উত্তরদাতাগণ যে তথ্য প্রদান করেছেন তাতে দেখা যায় যে,৫১ জন(১৯.৫%) উত্তরদাতা অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন,৮৬ জন(৩২.৮%) মাঝে মাঝে গুরুত্ব দেন,৭০ জন(২৬.৭%) গুরুত্ব দেননা এবং ৫৫ জন(২১%) উত্তরদাতা উত্তর প্রদানে বিরত থেকেছেন। এ ক্ষেত্রে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি বিষয় প্রভাবক হিসাবে কাজ করে তা এ অংশে পরীক্ষা করা হয়েছে।

৭.৮ শিক্ষার ভিত্তিতে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের বন্টন (% হারে)

ডশক্ষার ভিত্তিতে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের বন্টন					
শিক্ষা	হ্যাঁ	মাঝে মাঝে	না	নিরুত্তর	মোট
নিরক্ষর	৫৮	৯১	৯৩	৭০	৩১২
প্রাইমারী	১৬	১৯	৪৪	৪৫	১২৪
নিম্নমাধ্যমিক	১৯	৩৮	৪১	১৬	১১৪
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	২৭	৭৪	১৪	১৫	১৩০
স্নাতক+	১৯	১৪	০০	০০৭	৪০
মোট	১৩৯	২৩৬	১৯২	১৫৩	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। ৭.৮নং চিত্রেদেখাযাচ্ছে যে , শিক্ষার সাথে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক(কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০) রয়েছে। যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে ৫৮ জন(১৭.১%), যারা প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৬ জন(১৩.৬%), যারা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৯ জন(১৭.৫%),যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ২৭ জন(২৩.৩%) এবং যারা স্নাতক বা তার উর্ধ্বে লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৯ জন(৫৮.৩%)উত্তরদাতা অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তারা অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করেন বলে হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন। অন্যদিকে , যারা নিরক্ষর তাদের মধ্যে ৯১ জন(২৬.৮%), যারা প্রাইমারী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৯ জন(১৫.৯%), যারা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৩৮ জন(৩৫%), যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৭৪ জন(৬২.৮%) এবং যারা স্নাতক বা তার উর্ধ্বে লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৪ জন(৪১.৭%) উত্তরদাতা অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে মাঝে মাঝে গুরুত্ব দেন। অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন না নিরক্ষরদের মধ্যে ৯৩ জন(২৭.৬%), যারা প্রাইমারী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৪৪ জন(৩৬.৪%), যারা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৪১ জন(৩৭.৫%) এবং যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১৪ জন(১১.৬%)উত্তরদাতা। এছাড়া যারা উত্তরদানে বিরত থেকেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর এবং স্বল্প শিক্ষিত । অতএব দেখা যাচ্ছে যে , শিক্ষার সাথে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের সম্পর্ক বিদ্যমান।

৭.৯ ঃ পেশার ভিত্তিতে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের বন্টন (% হারে)

পেশা	হ্যাঁ	মাঝে মাঝে	না	নিরুত্তর	জানিনা	মোট
চাকুরি	১১	২২	০৮	০০	০০	৪১
গৃহিনী	৪৯	৪৭	৬০	০০	৭০	১৫৬
ব্যবসা	০৮	৪৪	৩০	০৫	০৭	৮৭
শ্রমিক	০৩	১৪	০৩	১১	১০	৩১
কৃষি	১৯	৩৩	৪৪	১৬	১৫	১১২
ছাত্র	১৬	২৭	০৩	০০	০০	৪৬
অন্যান্য	৩৩	৪৯	৪৪	১৯	০০	১৪৫
মোট	১৩৯	২৩৬	১৯২	৫১	১০২	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

পেশা অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। চিত্র ৭.৯থেকে দেখা যায় যে, চাকুরিজীবীদের মধ্যে ১১ জন(২৬.৭%), গৃহিনীদের মধ্যে ৪৯ জন(১৯.৪%),ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৮ জন(৯.৪%),শ্রমিকদের মধ্যে ৩ জন(৯.১%), কৃষকদের মধ্যে ১৯ জন(১৭.১%),ছাত্রদের মধ্যে ১৬ জন(৩৫.৩%) এবং অন্যান্যদের মধ্যে ৩৩ জন(২২.৬%) উত্তরদাতা অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন এবং এক্ষেত্রে হ্যাঁ সূচক উত্তর প্রদান করেছেন। অন্যদিকে , মাঝে মাঝে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন চাকুরিজীবীদের মধ্যে ২২ জন(৫৩.৩%),গৃহিনীদের মধ্যে ৪৭ জন(১৮.৩%), ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৪৪ জন(৫০%), শ্রমিকদের মধ্যে ১৪ জন(৪৫.৫%), কৃষকদের মধ্যে ৩৩ জন(২৯.৩%), ছাত্রদের মধ্যে ২৭ জন(৫৮.৮%) এবং অন্যান্যদের মধ্যে ৪৯ জন(৩৪%) উত্তরদাতা । অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন না এবং নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন যথাক্রমে ৮ জন(২০%),৬০ জন(২৩.৭%),৩০ জন(৩৪.৪%),৩ জন(৯.১%),৪৪ জন(৩৯%),৩ জন(৫.৯%) এবং ৪৪ জন(৩২.২%)উত্তরদাতা । নিরুত্তর থেকেছেন গৃহিণীদের মধ্যে ০০ জন, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৫ জন(৬.৩%), শ্রমিকদের মধ্যে ১১ জন(৩৬.৪%), কৃষকদের মধ্যে ১৬ জন(১৪.৬%) এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে ১৯ জন(১৩.২%) উত্তরদাতা। সুতরাং দেখা যায় যে, অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে পেশা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে কাই বর্গের ফলাফল =০.০০০।

সারণি -৭.১০ঃ রেডিও /টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার ভিত্তিতে অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব প্রদানের বন্টন।

	অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব				
রেডিও / টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখা	হ্যাঁ	মাঝে মাঝে	না	নিরুত্তর	মোট
নিয়মিত	১৬	৪৪	১১	০	৭১
মাঝে মাঝে	৫২	১১৩	৭৪	২৮	২৬৭
না	৭২	৭৯	১০৭	১২৪	৩৮২
মোট	১৪০	২৩৬	১৯২	১৫২	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.১০ থেকে দেখা যায় যে, রেডিও টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার সাথে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান । যারা নিয়মিত রেডিও/ টিভিতে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের অধিকাংশই অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে , যারা মাঝে মাঝে রেডিও / টিভিতে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ (৮৪.৫%) উত্তরদাতাই অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন। যারা মাঝে মাঝে রেডিও / টিভিতে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে (৬১.৯%) উত্তরদাতা অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু যারা রেডিও /টিভিতে সংবাদ শুনেন না কিংবা দেখেন না তাদের মধ্যে (৩৯.৬%) উত্তরদাতা অন্যের রাজনৈতিক মতামতকে গুরুত্ব দেন। এক্ষেত্রে কাইবর্গ করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা হল ০.০০০।

৭.গ. রাজনৈতিক বিশ্বাস

বিশ্বাস হলো পূর্ব ধারণামুলক দর্শন বা বিশ্বদৃষ্টি। তাই কোন কিছুর অস্তিত্ব বা অবস্থিতিকে নির্বিচারে স্বীকার করাকে বিশ্বাস বলে অভিহিত করা যায়। রাজনীতিতে মানুষের অংশগ্রহণ বা রাজনীতির ব্যাপারে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির সাথে তাদের বিশ্বাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৩৮] কেননা মানুষ কোন বিষয়ের প্রতি যে ধরনের বিশ্বাস বা মনোভাব পোষণ করে , কার্যক্ষেত্রেও অনুরূপ আচরণ করে । গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক বিশ্বাস বা পূর্ব ধারণা বিদ্যমান । তাদের এই বিশ্বাস প্রধানত ভক্তিবাদী ধারার , যুক্তিবাদী ধারার নয় । নিম্নোক্ত টেবিলগুলো হতে গ্রামের মানুষের রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে-

উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্তিঃ "রাজার ছেলেই রাজা হবে বলে কি আপনি মনে করেন?" ম্যাকলের উক্তি হতে দেখা যায় যে, বৃটিশ শাসন আমাদের মন জগতও দখল করে নিতে চেয়েছিল এবং অনেকটা পেরেছিলও। তার প্রভাব বর্তমানেও গ্রাম বাংলায় আমরা দেখতে পাই । রাজারানীদের প্রতি ভক্তি , সহানুভুতি ও আদেশ মান্য করার প্রবণতা দেখা যায়।

কারণ গ্রামের অধিকাংশ মানুষ এখনও সরকার প্রধান ,প্রেসিডেন্ট , প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদি কথাগুলো বোঝে না। তারা সরকার প্রধানকে 'রাজা'বলেই আখ্যায়িত করে।

প্রশ্নের মাধ্যমে মূলতঃ জানতে চেষ্টা করা হয়েছে জনগণ "উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ক্ষমতা" নাকি "অর্জিত ক্ষমতার " প্রতি মত প্রকাশ করে। জনগণের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে এর মাধ্যমে জানা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী -৭.১১ঃ পুরুষদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ঃউত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্তি

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করি	১২০	২০%
বিরোধিতা করি	২৪০	৪০%
জানি না	১৪৪	২৪%
সমর্থন করি	৯৬	১৬%
মোট	৬০০	১০০%

উপরোক্ত তথ্য হতে দেখা যায় উপরোক্ত তথ্য হে দেখা যা বেশিরভাগ লোকই রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে না। তবে যারা তাদের অবস্থানে দৃঢ় তাদের হার ২০%। এদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত . উচ্চশিক্ষিত, চাকুরীজীবি বা সচেতন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে যারা সাধারণভাবে বিরোধিতা করেছে তাদের হার ৪০%। জানি না বলেছে ২৪% লোক । তাদের আয় , শিক্ষা , অবস্থা তেমন ভাল না । এরা জীবন বিমূখ এবং রাজনৈতিক বিষয়ে তেমন কোন খবরা- খবর রাখে না এবং আগ্রহও নেই । আর বেশ কিছু লোক সমর্থন করেছে এই অর্থে যে, আগের দিনই ভাল ছিল। পাক ও ব্রিটিশ আমলের উদাহরণ দিয়ে তারা সুখের স্মৃতি স্মরণ করে। এরা মূলতঃ বৃদ্ধ ও বয়স্ক শ্রেণীর লোক এবং বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা দলীয় কার্যক্রমের উপর বিরক্ত হয়েই তারা এ ধরনের মনোভাব পোষণ করেছে। পাশাপাশি তারা রাজা, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের প্রতি সহানুভিশীল হয় ও ইতিবাচক উত্তর দিয়েছে। তাদের মতে "রাজার ছেলে রাজা না হলে কেমন হয়, তাদের একটা সম্মান আছে না। "

সারণী -৭.১২ঃ মহিলাদের রাজনৈতিকবিশ্বাস ঃ উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা প্রাপ্তি

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করি	১৭	১৪%
বিরোধিতা করি	৪৩	৩৬%
জানি না	৩১	২৬%
সমর্থন করি	২৯	২৪%
মোট	১২০	১০০%

মহিলাদের মধ্যে হতে প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ মহিলাই বলেছে "জানি না ", "বুঝি না " । তাদের অনেক বুঝিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও বলছে,"আমরা এতকিছু বুঝি না , কাম করি, ভাত খাই । " তবে শিক্ষিত বা একটু

Dhaka University Institutional Repository

অল্প বয়স্ক গৃহিনীরা বিষয়টিকে সমর্থন করছে না। এ থেকে বোঝা যায় যে, ধীরে ধীরে নারী সমাজের মানুষের মধ্যে অগণতান্ত্রিক বিষয়ের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। গণমাধ্যমে তথ্য বিস্ফোরণ , শিক্ষা ও এনজিও কার্যক্রম এর পেছনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

দলীয় কোন্দল ঃ "আওয়ামী লীগ- বি.এন.পি- র কোন্দল দেশকে কি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে?"বিরোধী দল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সচল রাখার একটি অন্যতম মাধ্যম। কারণ সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে এই বিরোধী দল এবং জনগণের কাছে সরকারের ভাবমূর্তি তুলে ধরে।তাদের তর্ক বিতর্ক রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখে। এই প্রক্রিয়া যদি সুষ্ঠুভাবে না হয় এবং বিরোধী দল যদি সরকারের অযথা সমালোচনায় বিভোর থাকে,পাশপাশি যদি সরকারও বিরোধী দলের সমালোচনা ও অধিকার হানির চেষ্টায় থাকে তবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অচল হয়ে যায়। এ প্রশ্নটি করা হয়েছিল দেশের বর্তমান অবস্থাকে সামনে রেখে । কেননা , যে ধরণের কোন্দল দেশে বিরাজমান তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরে না। আবার ভবিষ্যতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা তা নির্ভর করে জনগণের মানসিকতার উপর । তাই জনগণ বিষয়টিকে সমর্থন করছে কিনা তা দেখার জন্য প্রশ্নটি করা হয়েছিল।

সারণী - ৭.১৩ঃ পুরুষদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ঃ দলীয় কোন্দল

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
অবশ্যই	৯৬	১৬%
হ্যাঁ	৩৮৪	৬৫%
জানি না	৯৬	১৪%
না	২৪	৫%
মোট	৬০০	১০০%

উত্তরে অধিকাংশ পুরুষই প্রশ্নটির প্রতি সমর্থন প্রদান করেছে। অবশ্য কিছু ছাত্র , শিক্ষক এবং সচেতন শ্রমিকেরা বিষয়টিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। বিষয়টি হতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সর্বত্রই যে আওয়ামী -বি. এন.পি- দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ হয় সে সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ভাল মনোভাব নেই । আবার এদের যথার্থ বিকল্প না থাকাতে সার্বিকভাবে রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ঃ ৭.১৪ মহিলাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ঃ দলীয় কোন্দল

উত্তরের ধরণ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
অবশ্যই	১৪	১২%
হ্যাঁ	৫৩	৪৪%
জানি না	৩৪	২৮%
না	১৯	১৬%
মোট	১২০	১০০%

মহিলাদের মধ্যে দলীয় ব্যাপারে তেমন একটা ধারণা দেখা যায়নি। তারা সাধারণভাবে সমর্থন করেছে। তবে খোঁজ - খবর রাখেনা বা জানে না ইত্যাদির সংখ্যাও অনেক বেশি । তবে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক কোন্দল দেশকে ধ্বংস করছে বা কি করছে না তা না জানার মনোভাব বেশী দেখা গেছে।

সার্বিক ভাবে দেশের অধিকাংশ মানুষই কোন্দলীয় রাজনীতিকে পছন্দ করছে না। এ থেকে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা যায়। ভূমি, পেশা , আবহাওয়া প্রভৃতি কারণে এদেশের মানুষের সহজ সরল জীবনে তারা যে শান্তি প্রত্যাশী তা তাদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। তবে এই শান্তি প্রত্যাশার মধ্যেও তাদের নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। তারা ঝামেলা , অশান্তি পছন্দ করছে না । কিন্তু রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করার কারণে কতিপয় লোক- যারা রাজনীতিতে আসছে তারাই নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে দলাদলিতে লিপ্ত থাকছে। সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ থাকলে হয়ত এই কোন্দল এড়ানো সম্ভব হতো।

রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ধারণাঃ "আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা সৎ নয় "- প্রশ্নটি গ্রামের মানুষের মধ্যে করা হলে অধিকাংশ লোকই এ প্রশ্নের স্বপক্ষে উত্তর প্রদান করেছে। বিশেষ করে পুরুষেরা প্রায়ই বলেছে যে, রাজনীতিবিদগণ সৎ নয়। তবে মহিলাদের মধ্যে কিছু বলেছেন যে, "সৎ মানুষও আছে, না থাকলে কি দেশ চলতো ।" এই উত্তর হতে একদিকে আমরা রাজনীতি সম্পর্কে তাদের খোঁজ খবর না নেয়াকেও ধরতে পারি।

তবে সার্বিকভাবে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে জনগণের খুব একটি ভাল ধারণা নেই । এর পেছনে অবশ্য রাজনীতিবিদদের দীর্ঘদিনের দলাদলি , দলবদল , স্বার্থপরতা , অসহিষ্ণু মনোভাব ইত্যাদিকে দায়ী করা যেতে পারে। তাদের ধারণা আগে ভাল ,শিক্ষিত , সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ রাজনীতি করতো । আর এখন ভাল মানুষ রাজনীতি করে না। স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনগুলোকে তারা নমুনা হিসাবে তুলে ধরে। অধিকাংশ মত প্রকাশ করে যে, নির্বাচনের পর জনগণের সেবার পরিবর্তে তারা নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যস্ত থাকে। জনগণের সাথে রাজনীতিবিদদের

Dhaka University Institutional Repository

গণবিচ্ছিন্নতা বা তাদের প্রতি অসন্তুষ্টির চিত্র এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠে। রাজনীতিবিদরা মানুষ হিসাবে খারাপ জেনেও তাদের কাউকে না কাউকে বেছে নিতে তারা বাধ্য হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প না থাকায় গ্রামীণ জনগণ অসৎ রাজনীতিবিদদের দ্বারা শাসিত হওয়াকে ভাগ্য বলে মেনে নিচ্ছে।

ধর্ম ও রাজনীতি ঃ "ধর্ম হতে রাজনীতি পৃথক হওয়া উচিত বলে কি আপনি মনে করেন?" রাজনীতির সাথে ধর্মের সম্পৃক্ততাকে জনগণ কিভাবে দেখছে তা দেখার জন্য গ্রামের মানুষের কাছে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর হয়েছিল - ধর্মীয় বিশ্বাসও তাদের রাজনেতিক বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে। তাদের মধ্যে কতটুকু কি পরিমাণে ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে তা জানার চেষ্টা করা হয় । একদিকে গ্রামের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রবল, অন্যদিকে এদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার রাজনীতিও বহুদিনের । [৩৯] আর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির স্বপক্ষে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। লক্ষ্য করা যায় যে, ধর্মীয় রাজনীতির পীড়নের কারণেই ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যার চেয়ে ধর্মীয় রাজনীতির সমর্থকের সংখ্যা নগণ্য।

সারণী -৭.১৫ পুরুষদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ঃ ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি

উত্তরের ধরণ	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে	৬০	১০%
স্বীকার করে	৩৩৬	৫৬%
জানে না	৭২	১২%
অস্বীকার করে	৯৬	১৬%
দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে	৩৬	৬%
মোট	৬০০	১০০%

পুরুষের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির পক্ষেই বেশী সংখ্যক রয়েছে। তবে এদের মধ্যেও সচেতনভাবে স্বীকার করছে মুষ্টিমেয়। এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এই ধর্মনিরপেক্ষতার মনোভাব গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন কবি , সাহিত্যিক ,লেখকদের লেখায় এর ছাপ দেখা যায়-যার সঙ্গে পুরুষগণ পরিচিত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৭.১৬ মহিলাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ঃ ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি

উত্তরের ধরণ	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে	৫	৪%
স্বীকার করে	৫৩	৪৪%
জানে না	৩৪	২৮%
অস্বীকার করে	১০	৮%
দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে	১৮	১৬%
মোট	১২০	১০০%

মহিলাদের মধ্যে "জানি না , বুঝি না " এ ধরণের উত্তর পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি । ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক হওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে তাদের কোন সুনির্দিষ্ট মতামত নেই । মুলতঃ তারা ধর্মকে প্রাধান্য দেয় আবার রাজনীতিকে ধর্মের সাথে এক করে ধর্মকে কলুষিত করতেও রাজী না । তবে তারা মন্তব্য করেন যে, " ধর্মের নিয়ম কানুন দ্বারা দেশ চললে নাকি ভালই হতো" এবং " দেশে ধর্ম নাই , রাজনীতিই বেশী "এ ধরণের মন্তব্যও তাদের কাছ থেকে এসেছে। অর্থাৎ ধর্মীয় রাজনীতির প্রতি একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রযে গেলেও ধর্মীয় আইন দিয়ে দেশ চললে তা ভাল মনে করে ।

৭.ঘ. সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে ঐকমত্য ঃ

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম দুটি শর্ত হচ্ছে জাতীয় এবং মৌলিক বিষয়ে সমঝোতা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা । হান্টিংটন (Huntington) বলেন, "অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণত হিংস্রতা কম"[৪০] কিন্তু গণতন্ত্রে শুধু আপোষ বা সমঝোতাই (Compromise) থাকে না দ্বন্দ্বও থাকে । যার কারণে গণতন্ত্রকে একটি দ্বন্দ্বপূর্ণ অবস্থা (Conflictual Condition) হিসেবে মনে করা হয় । তবে গণতন্ত্রে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে । এ্যালমন্ড ও ভারবার (Almond and Verba) মতে , গণতন্ত্রে দ্বন্দ্ব থাকবে কিন্তু তা মাত্রাতিরিক্ত নয়,এখানে প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু তা থাকবে গ্রহনীয় চৌহদ্দির মধ্যে;গণতন্ত্রে বিভক্তি থাকবে তবে তার প্রশমন হবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ।[৪১] সারতরী (Sartory) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার ক্ষেত্রে দ্বন্দ এবং ঐকমত্য দুটিকেই সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি বলেন যে, " মৌলিক বিষয়ে দ্বন্দ্ব গণতন্ত্রের এমনকি কোন ব্যবস্থারই সম্ভাব্য ভিত্তি হতে পারে না। "[৪২] রবার্ট ডাল (Robert Dahl) ঐকমত্যের উপর জোর দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তার মতে , গণতন্ত্র মূল্যবোধগত ঐকমত্যে স্থিরতা লাভ করে (Anchored to value consensus) [৪৩] তিনি আরও বলেন , " ঐকমত্য যত বেশি হবে গণতন্ত্র তত সফল হবে । " [৪৪]

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য ঃ

সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা কেবল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই জরুরী নয় গনতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি ঐতিহ্যগত ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অত্যাকশ্যকীয় । তাই বর্তমান গবেষণার এ অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার উত্তরদাতাদের সবার নিকট একটি সাধারণ প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তা হল ঃ আপনি কি মনে করেন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন? এ প্রশ্নের উত্তরে গ্রামীণ জনগণ যে মতামত প্রদান করেছেন তা নিম্নে সারণি ও চিত্রে উপস্থাপন করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কোন কোন চলকের গভীর প্রভাব এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চিত্র ৭.১৭ ঃ শিক্ষার ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত বন্টন (%হারে)

নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস				
শিক্ষা	প্রয়োজন আছে	প্রয়োজন নেই	জানি না	মোট
নিরক্ষর	২৩৬	৩	১৩৫	৩৭৪
প্রাইমারী	৬৬	০	২০	৮৬
নিম্ন মাধ্যমিক	৯৬	০	১১	১০৭
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক	১১৮	০	২	১২০
স্নাতক +	৩৩	০	০	৩৩
মোট	৫৪৯	৩	১৬৮	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করার বিষয়ে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে গুরু প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। চিত্র ৭.১৭ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যারা নিরক্ষর বা অক্ষরজ্ঞান হীন তাদের মধ্যে ২৩৬ জন(৬৯.৯%),যারা প্রাইমারী লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৬৬ জন(৬৫.৯%), যারা নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৯৬ জন(৮৭.৫%), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ১১৮ জন(১০০%) এবং যারা বা তার উর্ধ্বে লেখাপড়া করেছেন তাদের মধ্যে ৩৩ জন(১০০%) উত্তরদাতা সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। ৩ জন মাত্র উত্তরদাতা নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন যিনি লেখাপড়া জানেন না। অন্যদিকে , যারা উত্তরদানে বিরত থেকেছেন কিংবা জানি না উত্তর প্রদান করেছেন তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর এবং কিছু সংখ্যক প্রাইমারী পর্যন্ত লেখাপড়া জানা উত্তরদাতা । সুতরাং দেখা যাচ্ছে , শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে ঐকমত্য প্রশ্নে ইতিবাচক উত্তর প্রদানের মাত্রাও বেড়ে যাচ্ছে। কাইবর্গ করে দেখা গেছে যে শিক্ষার সাথে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত প্রদানের কার্যকারণ বিদ্যমান । এখানে কাইবর্গের ফলাফল=০.০০৩। কাজেই বলা যায় সে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেতনাও বৃদ্ধি পাবে।

সারণি - ৭.১৮ঃ বয়সের ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত বন্টন।

	সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত				
বয়স	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	জানি না	মোট
১৮-২৫	১৩২	০	৪১	৮	১৮১
২৬-৩৫	১৮১	০	৪৭	১১	২৩৯
৩৬-৪৫	৯৯	৩	১৭	৩	১২২
৪৬-৫৫	৮৫	০	৮	০	৯৩
৫৬-৬৫	৪৭	০	১৭	০	৬৪
৬৬+	১৯	০	২	০	২১
মোট	৫৬৩	৩	১৩২	২২	৭২০

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তির বয়স সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে কাজ করতে পারে। সারণি ৭.১৮ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশি বয়স্ক ও মধ্য বয়স্করা অন্যান্যদের তুলনায় সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন। সারণিতে উপস্থাপিত তথ্যের সার্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরলে দেখা যায় যে,১৮-২৫ বছরের মধ্যে১৩২জন(৭২.৭%), ২৬-৩৫ বছরের মধ্যে ১৮১ জন(৭৫.৯%),৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে ৯৯ জন(৮১.৮%),৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে ৮৫ জন(৯১.২%),৫৬-৬৫ বছরের মধ্যে ৪৭ জন(৭৩.৯%) এবং ৬৬ বছরের উর্ধ্বে বয়সের ১৯ জন(৮৭.৫%) উত্তরদাতা সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন বলে মনে করেন এবং এক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন। অন্যদিকে , নেতিবাচক বা না সূচক উত্তরদান করেছেন ৩ জন(২.৩%) । তাদের বয়সের সীমা হল ৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে । সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রশ্নে নিরুত্তর থেকেছেন ১৮-২৫ বছরের মধ্যে ৪১ জন(২২.৭%),২৬-৩৫বছরের মধ্যে৪৭ জন(১৯.৫%),৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে ১৭ জন(১৩.৬%), ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে ৮ জন(৮.৮%), ৫৬-৬৫ বছরের মধ্যে ১৭ জন(২৬.১%) এবং ৬৬ বছরের উর্ধ্বে বয়সের ২ জন(১২.৫%) উত্তরদাতা । যারা জানি না বলে উত্তর প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন যুবক ও মধ্যবয়স্করা । সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, অপেক্ষাকৃত বয়স্ক উত্তরদাতাগণের মধ্যে ইতিবাচক উত্তর প্রদানের মাত্রা বেশি হলেও তাদের মধ্যে আবার নিরুত্তরের প্রবণতাও বেশি। ফলশ্রুতিতে বয়সের সাথে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত প্রদানের তেমন সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না। এই ক্ষেত্রে কাই বর্গের ফলাফল (০.৫৭৭)।

সারণি -৭.১৯ঃ লিঙ্গের ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত বন্টন ।

	সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত				
লিঙ্গ	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	জানি না	মোট
পুরুষ	৫১৯	৪	৭০	৭	৬০০
এহিলা	৪৪	০	৩৫	৪১	১২০
মোট	৫৬৩	৪	১০৫	৪৮	৭২০

সারণি ৭.১৯ থেকে দেখা যায় যে, মহিলাদের তুলনায় পুরষদের মধ্যে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতিবাচক উত্তর প্রদানের মাত্রা বেশি। অন্যদিকে , মহিলাদের মধ্যে নিরুত্তর ও জানি না বলে উত্তর প্রদানের মাত্রা বেশি । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে , লিঙ্গের সাথে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ঘনিষ্ট সম্পর্ক (কাইবর্গের ফলাফল=০.০০০) রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৭.২০ঃ রেডিও / টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখার ভিত্তিতে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত বন্টন।

	সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য বিষয়ে মতামত				
রেডিও / টিভিতে সংবাদ শুনা বা দেখা	হ্যাঁ	না	নিরুত্তর	জানি না	মোট
নিয়মিত	৭১	০	০	০	৭১
মাঝে মাঝে	২৩১	০	৩৫	০	২৬৬
না	২৬১	৩	৯৬	২৩	৩৮৩
মোট	৫৬৩	৩	১৩১	২৩	৭২০

প্রচার মাধ্যম ব্যবহার ব্যক্তির মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে। সারণি ৭.২০ থেকে দেখা যায়, যারা নিয়মিত রেডিও/টিভিতে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের সবাই ১০০% ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন । যারা মাঝে মাঝে সংবাদ শুনেন বা দেখেন তাদের মধ্যে ২৩১জন(৮৬.৬%) উত্তরদাতা ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন। বাকী ৩৫ জন(১৩.৪%) উত্তর দানে বিরত থেকেছেন। অন্যদিকে , যারা রেডিও / টিভিতে সংবাদ শুনেন না কিংবা দেখেন না তাদের মধ্যে ২৬১ জন(৬৮.৩%) উত্তরদাতা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি ইতিবাচক উত্তর প্রদান করেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, গণমাধ্যমের ব্যবহার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে । এক্ষেত্রে কাইবর্গের ফলাফল = ০.০০০।

গ্রামের মানুষের যে বিশ্বাস তা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের পক্ষে ততটা ইতিবাচক নয়। সামন্তীয় নিয়তিবাদী ধ্যান ধারণা জনগণের মধ্যে রয়েই গেছে। সামন্তীয় ধ্যান ধারণার কারণে তারা সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে যেমন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণবাদের উপর নির্ভরশীল। আর এ কারণেই রাজনীতিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে বেশী খোঁজ খবর রাখে না এবং রাখার প্রয়োজন মনে করে না। তাদের শিক্ষার অভাবে একদিকে যেমন নিজেদের অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতন নয় , অধিকাংশ গ্রামবাসী তেমনি দারিদ্রের কারণে রাজনৈতিক তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ- সুবিধা হতেও বঞ্চিত আর এই সুযোগে দেখা যায় যে, স্থানীয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গ বা নেতৃবৃন্দ ,

Dhaka University Institutional Repository

মাতব্বরেরা তাদের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকে নিজ নিজ স্বার্থে । স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাই তারা যেমন বিমুখ- জাতীয় রাজনীতির প্রতিও তাদের ভাল ধারণা নেই । স্থানীয় ও জাতীয় নেতা কর্মীদের কার্যকলাপই অবশ্য তাদের এ ধরণের ধারণা জন্মানোর পেছনে দায়ী।

বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি তাদের জীবন ধারাতে আরও বেশী নিষ্ক্রিয়তার প্রভাব ফেলে । তারা বাইরের সাথে বেশী যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে না। পারিবারিক ও সামাজিক বাধা নিষেধের কারণে একজন নারী সমস্ত জীবনই নির্ভরশীল ও অধিনস্ত হয়ে জীবন -যাপন করে। ফলে তা মানসিক ভাবেও অনুরূপ নির্ভরশীলতাকে বিশ্বাসের পর্যায়ে নিয়ে যায়, আনুগত্য স্বীকার করে নেয়।

গবেষণা এলাকার ৭২০জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭১৩ জন(৯৮.৯%) উত্তরদাতাই নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রয়োজন বলে মতামত প্রদান করেছেন ।তাদের মতে , " নির্বাচন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় এ কারণে যে, এর মাধ্যমে আমরা ভোট দিয়ে নেতা নির্বাচন করতে পারি। " আইনের শাসনের প্রতিও তাদের আস্থা এবং শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। ৭২০জন উত্তরদাতার মধ্যে ২০৯ জন(২৯%) উত্তরদাতা আইনের শাসনকে "অবশ্যই প্রয়োজন আছে"এবং ৫০৮ জন(৭০.৬%) উত্তরদাতা 'প্রয়োজন আছে'বলে মন্তব্য করেছেন। অর্থ্যাৎ ৩ জন ব্যতীত বাকী সকল উত্তাদাতাই আইনের শাসনে প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছেন। হরতাল বা ধর্মঘট আদায়ের একটি মাধ্যম হলেও ৬২৪ জন(৮৬.৬%) উত্তরদাতা হরতার বা ধর্মঘটকে সমর্থন করেন না । যারা সমর্থন করেন কিংবা কিছুটা সমর্থন করেন তাদের অধিকাংশই কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত । নারী নেতৃত্বের প্রতিও তাদের সমর্থন আছে।৬১.১%উত্তরদাতা নারী নেতৃত্বকে সমর্থন করেন । প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বাধীন চলকের বা বিভিন্ন প্রভাবকের যেমন , বয়স . শিক্ষা , পেশা , ধর্ম , বৈবাহিক অবস্থা , লিঙ্গ , আয় ও গণমাধ্যমের পৃথক পৃথক প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে স্বাধীন চলকটির প্রভাব বেশি প্রতীয়মান হয়েছে তা হল শিক্ষা । সুতরাং গ্রামীণ জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির প্রতি সচেতন ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে।

গবেষণা এলাকার গ্রামীণ জনগণের অধিকাংশই সরকারের কর্মকান্ড ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল । তবে গ্রামীণ নেতৃত্ব অর্থাৎ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীলতা কম এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে তারা নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করেন। কিন্তু তারা আবার স্থানীয় নেতৃত্বকে একেবারে অস্বীকারও করতে পারেন না । গ্রামীণ জনগণের বিশ্বাস যে ,নেতারা তাদের ঠকাচ্ছে, তারা তা বুঝতে পারেন কিন্তু করার কিছু নেই।অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ৭২০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে ৫৬৩ জন(৭৮.২%) ইতিবাচক ,৩ জন(০.৪%) নেতিবাচক,১৩২ জন(১৮.৩%) নিরুত্তর এবং ২২ জন(৩.১%) উত্তরদাতা জানিনা বলে মতামত প্রদান করেছেন। অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি আবার শিক্ষা , আয় , লিঙ্গ,পেশা , গণমাধ্যম ইত্যাদি চলক দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং এ অধ্যায় থেকে দেখা যাচ্ছে যে, অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের বা শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়টি গ্রামীণ জনগণের মধ্যে তেমন বিকশিত হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার এ অধ্যায়ে সরকার পরিবর্তন / ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের পদ্ধতির বিষয়টি পরিমাপ করতে যেয়ে যে চিত্রটি পরিস্ফুটিত হয়েছে তা হলো , গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি গ্রামীণ জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস প্রবল । তাতে গ্রামীণ জনগণ এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার তেমন অবকাশ পায় না বা পাবার চেষ্টা করে না। তবে গণতন্ত্র , গণতান্ত্রিক আদর্শ , রীতিনীতির ও মুল্যবোধের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য নির্দেশিকা

1. Ali, Raisa, Representative Democracy and Concept of Freeand Fair Elections, New Delhi, Deep and Deep publications, 1996, P.19
2. Ali, Raisa, Ibid, p.p. 19-21.
3. রশীদ,মোহাম্মদ আবদুর , "নির্বাচন সংক্রান্ত দর্শন ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আচরণঃ তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত", সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ৫৭, আগষ্ট ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৩১।
4. রহমান, মোঃ মাকসুদুর, রাষ্ট্রীয় সংগঠণের রূপরেখা, রাজশাহী , রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৪১০-৪১১
5. ঠাকুর, আব্দুল হান্নান, নির্বাচন, বাংলা একাডেমী , ঢাকা, ১৯৮৫,পৃষ্ঠা-১
6. রায়হান অদুদ , ভোটাধিকার সম্পর্কে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগনের সচেতনতা ঃ হাজীপুর গ্রামের একটি কেস স্টাডি, এম. এস. এস. থিসিস, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ , জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০, পৃষ্ঠা-২৭
7. রায়হান, অদুদ, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা ২৯-৩০
8. ঠাকুর , আব্দুল হান্নান, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা-৩৯
9. Huq, M. Mahfuzul, Electoral Problems In Pakistan, Dhaka, Asiatic Society of Pakistan, 1966, p.p.21-23
10. হক , আবুল ফজল , বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা , বাংলা একাডেমী , ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ৩৮-৪২
11. Huq, M. Mahfuzul, Ibid,p.p. 155-157.
12. ঠাকুর, আব্দুল হান্নান, প্রাগুপ্ত , পৃষ্ঠা-৪৬
13. Mannan, Md. Ablul, "Quest for a Democratic Order in Past Independent Bangladesh (1972-75)" *Asian Studies,* No-18,June 1999,p. 43.
14. Jahan, Rounaq, Bangladesh Politics : Problems and Issues, Dhaka, University press Limited, 1980,p.p.172-176.
15. Harun, Shamsul Huda, Bangladesh Voting Behaviour: A Psechological study 1973, Dhaka University Press, 1986, p.p. 3-5.
16. Hassanuzzaman, Dr. Al Masud, "Jatiya Sangsads (Legisl-atures) in Bangladesh: An Overview ", Asian Studies, No.8, June 1999, p-57

Dhaka University Institutional Repository

17. Shahidullah,A.K.M., "Electoral Politics In Bangladesh: A study of 1981 Presidential Election ", Social science review, vol-1, no-1, December 1984.

18. Khan, Md. Mohabbat and Habib, Md. Zafarullah, "The 1979 Perliamentary Election in Bangladesh", in Ahmed , Emajuddin, ed., Bangladesh Politics, Dhaka, centre for social studies, 1980,p.p.117-135

19. Thiagraph, Jeevan, Governance and Eloctoral process in Bangladesh, New Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1997,p-9

20. ঠাকুর, আব্দুল হান্নান, প্রাগুপ্ত পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫

21. আলম , মোহাম্মদ শহীদুল ও অন্যান্য, জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ঃ একটি মূল্যায়ন, কাকরাইল , সার্কিট হাউস ,১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১১-১২

22. ঠাকুর, আব্দুল হান্নান, প্রাগুপ্ত, পৃষ্ঠা -১২১

23. Mannan, Md. Abdul and Alam, Md. Shamsul , "The June 1996 Parliamentary Election: A Quest for Stability And Democracy", Asian Studies, No-16,June 1997, p.p. 14-24.

24. Bhuyan, Sayefullah and Goswami, Arun Kumar, "The June 1996 Parlimentary Election in Bangladesh: A Review", Social Science Review, vol-xv, no-2, December 1998, p.26.

25. Bangladesh, Parliamentary Election'96 Observation Report, Election to the 7th Parliament 1996, Dhaka, BMSP(CCHRB), July 1996, p.23

26. Ahmed, Fakhruddin, The Caretakers: A first Hand Account of the interium Government of Bangladesh 1990-91,Dhaka, University Press Limited, 1998.

27. রহমান, সৈয়দ সাদিকুর , অষ্টম জাতীয় সংসদ ঃ আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু , সচিত্র বাংলাদেশ, vol-22, no-22, November 2001, c,,t 11-13

28. অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০১, প্রফেসর্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স , ঢাকা , প্রফেসর্স প্রকাশন, নভেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৭।

29. The Parliamentary Elections in Bangladesh 12 June 1996, The Report of the Commonwealth observer group, Britain Commonwealth Secretariate, 1997 Britain, p.p. 3-4.

Dhaka University Institutional Repository

30.Dhaka courior, 7th June 1996, and FEMA, 1996 Election Report, এবং প্রফেসর্স কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, নভেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা ৬৫।

31. হক , ডঃ আবুল ফজল , বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ সংঘাত ও পরিবর্তন (১৯৭১-১৯৯১),রাজশাহী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড,১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৪১

32.Dahl, Robert A., Polyarchy: Participation and Opposition, New Haven, CT Yale University Press,1971, p.p.-3-20.

33.Verba, Sidney, Norman H. Nie and Jae-on-kim,Political Participation and Political Equality; A Seven Nation Comparison, Cambridge University Press, 1978, p.p.46-47

34.Schumpeter, Joseph, Capitalism, Socialism and Democracy, Union Paperbacks, 1987, p. 269.

35.Huntington, S.P. The Third Wave: Democratzation in the Late Twenty Century, University of Oklahama Pre 1991, p. 174.

36.আলম, মোঃ শামসুল , " রাজনীতি ও হরতাল ঃ বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট", রাষ্টবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা ,১৯৯১, পৃষ্ঠা ১

37.আহমদ , ডঃ এমাজ উদ্দিন , "আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি", দৈনিক ইত্তেফাক , ১৪ আগষ্ট ২০০১

38.Ahmed, K.S. and khan, M. Solimulla, "Belief System, Party preference ans Voting Behaviour : A Case study of Four Villagers", in the Journal of Statistical Studies, December,1

39.Khan, Shamsul Islam; Isalm S. Aminul; Haque M. Imdadul, Political Culture, political Parties and the Democratizatiion in Bangladesh, Academic Publishers, Dhaka, 1996:1

40.Huntinglon--------p.28

41.Almond, Gabriel A. and Sidney Verba, "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Boston: Little Brown and Co, 1965, p.p. 356-360.

42.Sartori, Giovanni, parties and Party System: A Framework for Analysis, vol.1, Cambridge University Press, 1976,pp.15-1

43.Held, David, Models of Democracy, Polity Press, 1977, p. 194.

44.Ibid, p. 194

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক বিজ্ঞানের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই সার্বজনীন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সুযোগ সীমিত । ফলতঃ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের ন্যায় সমাজবিজ্ঞানীগণ প্যারাডাইস (Paradigm) নির্মাণ করতে পারেন না। এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় বের করার নিমিত্তে এ গবেষণাকর্মে কল্পিত অনুসিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সুশাসন একটি বহুমাত্রিক প্রত্যয় । এটি শাসন ব্যবস্থার সামগ্রিক দিক অর্থাৎ রাজনীতি, অর্থনীতি, লোক প্রশাসন , স্থানীয় ও জাতীয় শাসন , শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ, সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ,প্রশাসনের দক্ষতা ও আইনের শাসন সহ জনকল্যাণমূলক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
সুশাসনের বর্তমান অবস্থা এবং এর সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণেরর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের টাংগাইল জেলার গোপালপুর থানার ঝাওয়াইল ইউনিয়নকে গবেষণা এলাকা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে।
বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি ছোট এলাকায় (ইউনিয়নে) জরিপ চালিয়ে সুশাসনের সাথে জড়িত বা সুশাসনের পূর্বশর্ত হিসেবে পরিচিত ।
সকল বিষয় একটি গবেষণাকর্মে তুলে আনা সম্ভব নয়। আর তাই সুশাসন স্থাপনের জন্য কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা এবং সে বিষয়গুলোর উপর জনমত যাচাই করা হয়েছে। যেমন- সুশাসনের আনুষঙ্গিক বিষয় সরকার, নির্বাচন ,নেতৃত্ব ,জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ,বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক কৃষ্টির ধরণ এগুলো নিয়েই মূলত ঃ এ গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মটিকে সুষ্ঠু, বিজ্ঞানভিত্তিক ও পদ্ধতিগতভাবে সম্পন্ন করার জন্য কতিপয় অনুমান গঠন করা হয়েছিল। মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্যের সাথে মূল অনুমানগুলোকে যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। প্রথম অনুমানটি ছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের আয় নিম্ন পর্যায়ের , তাদের শিক্ষার হার কম, ধর্মীয় প্রভাব ও কুসংস্কার বিদ্যমান, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা, পেশা , আয় প্রবলভাবে কাজ করে ।এই অনুমানটি অনেকাংশে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষণ হতে দেখা যায় অন্যান্য সকল উপাদানের চেয়ে শিক্ষাই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে অন্যতম কারণ। শিক্ষা ব্যক্তিকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রশিক্ষণ দেয়, তাকে তথ্য সংগ্রহের শিক্ষা দেয় । ব্যক্তি শিক্ষিত হলে যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সাথে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারে। একই সাথে সে সরকার ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পেশা রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বা আগ্রহের একটি উলেখযোগ্য উপাদান। দেখা যায়, বয়স্করাই কৃষি পেশার সাথে সাধারণত জড়িত। এর ফলে গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতির ব্যাপারে তারা উদাসীন। অন্যদিকে চাকুরীজীবী , ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বা অংশগ্রহণের মাত্রা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী । শ্রমিকরাও (অল্প শিক্ষত বা অশিক্ষিত) এক্ষত্রে কৃষকদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। কারণ, কাজের জন্য তাদেরকে বাইরে যেতে হচ্ছে, অনেকের সাথে মেশার সুযোগ পাচ্ছে । আবার ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মাত্রা সবচেয়ে বেশি । অংশগ্রহণের মাত্রার ভিত্তিতে পেশাগুলোকে আমরা এভাবে সাজাতে পারি- ছাত্র , চাকুরীজীবী , ব্যবসায়ী , শ্রমিক এবং কৃষক। যত আধুনিক পেশার সাথে ব্যক্তি জড়িত তার রাজনৈতিক সচেতনতা, রাজনীতিতে অংশগ্রহনের মাত্রা, নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা, সরকারী ও বিরোধীদলের কর্মকান্ড মূল্যায়ন ও এসম্পর্কে সচেতনতা বেশি তৈরী হয় যা সুশাসনের জন্য অপরিহার্য বিষয়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, সুশাসনের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো অনুধাবনের ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের আয়ের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। দেখা যায়, স্বল্প আয়ের লোকেরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসচেতন, অনাগ্রহী এবং উদাসীন কিন্তু সমাজের বেশী আয়ের লোকেরা সব বিষয়ে তুলনামুলকভাবে বেশি সচেতন।

জরিপ চালাতে গিয়ে দেখা গেছে যে, মহিলাদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী রাজনীতি সচেতন। তারা তাদের অধিকার ও কর্তব্য, নেতা নির্বাচন সহ অন্যান্য বিষয়ে মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। মহিলাদের শিক্ষার হার কম, তাদের বাড়ীর বাইরের সাথে যোগাযোগ কম থাকাতে তারা রাজনীতিতে উৎসাহী নয়।

দ্বিতীয় অনুমানটি ছিল নির্বাচনী রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে গ্রামীন জনগণ তেমনভাবে সম্পৃক্ত নয়, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত এবং প্রচার মাধ্যম সীমিত। এ অনুমানটি সত্য প্রমানিত হয়েছে। বিভিন্ন উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, মাত্র ৩০% জনগণ নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত । এদের মধ্যে ২.০% নেতা এবং ৩.২% সক্রিয় কর্মী ও সমর্থনকারীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।এক্ষেত্রে লিঙ্গ ও ধর্মকে বিশেষ চলক হিসাবে কাজ করতে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, গ্রামীণ জনগণের নির্বাচনী রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার মাত্রা কম হলেও অধিকাংশ জনগনই অর্থাৎ ৯৫.২% জনগন নিয়মিত ভোট প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে গবেষণায় দেখা গেছে যে, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া , প্রার্থীর নির্বাচনী অঙ্গীকার , দলীয় প্রার্থীর কর্মী হওয়া, এ সম্পর্কে গ্রামীণ জনগনের মনোভাব তেমন ভাল নয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে,নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াকে ৪২.৪% জনগন জনকলাণমুলক কাজ বলেছেন। আর বাকী সবাই বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন । এছাড়া প্রার্থীর নির্বাচনী অঙ্গীকারকে ৪০.০% জনগণ জনগণের আশা আকঙ্খার প্রতিফলন হিসাবে দেখেছেন, আর ৪৮.০%জনগণ বিষয়টিকে নির্বাচনে জয়লাভের কৌশল হিসাবে দেখেছেন। তবে দলীয় প্রার্থীর কর্মীর কর্মকান্ডকে ৫২.৪% জনগণ ইতিবাচক

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিতে দেখেছেন। গণতান্ত্রিক বিশ্বে প্রচলিত রীতি হলো প্রথমে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করা এবং এর ভিত্তিতে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো । কিন্তু বাংলাদেশের গুটিকয়েক রাজনৈতিক দল ইশতেহার প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেও নির্বাচনী কৌশল তৈরির ক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারের খুব একটা ধার ধারে না। বরং স্থানীয়ভাবে লোভনীয় ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের দলে টানার চেষ্টা করে। নির্বাচনে জয়লাভের পরে নির্বাচন পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনের কোন বাধ্য বাধকতা থাকেনা । তাই সেগুলোর বেশীর ভাগ নিছক প্রতিশ্রুতিই থেকে যায় এবং পরবর্তী নির্বাচনে অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো পূরনের সুযোগ চেয়ে আবারও ভোটারদের প্রবঞ্চনা করা হয়। গ্রামের অধিকাংশ জনগণ নির্বাচনী ইশতেহার মূল্যায়নে তাদের মতামত ব্যক্ত করে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, ১২.০% জনগণ নির্বাচনী ইশতেহারকে জনকল্যাণকর কাজ হিসাবে,৫৬.০% উত্তরদাতা বিষয়টিকে নির্বাচনে জয় লাভের কৌশল হিসাবে এবং ১৯.৬% উত্তরদাতা বিষয়টিকে দলীয় স্বর্থ রক্ষার কৌশল হিসাবে দেখেছেন ।

তৃতীয় অনুমানটি ছিল বাংলাদেশের প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও দক্ষতার অভাব । প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অধিকাংশ উত্তরদাতাই কোন ধারণা নেই বলে উত্তর প্রদান করেছেন। এছাড়া নেতৃত্বের বিষয়ে প্রশ্ন করা হলেও দেখা গেছে রাজনৈতিক বিষয় গুলি সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই । গবেষণায় প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়টি প্রার্থীর কোন কোন রাজনৈতিক বিষয়গুলো ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ বিশ্লেষণে দেখা গেছে রাজনৈতিক বিষয়গুলি স্থানীয় নির্বাচনে কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটারগন এ বিষয়গুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিশ্লেষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রামীণ জনগণ এখনও রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে উঠতে পারেনি বা রাজনৈতিক বিষয়গুলি তাদের কাছে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলাদের কাছে রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ, নির্বাচনী ইশতেহার, নির্বাচনী প্রতীক ইত্যাদি বিষয়ে যথেষ্ট অস্পষ্টতা রয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজনৈতিক দল, মতাদর্শ প্রভৃতি বিবেচনার পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রার্থী নির্বাচনে ব্যক্তিগত গুণাবলী জনগণ কিভাবে মূল্যায়ন করেন সে সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষন করা হয়েছে। দেখা গেছে , প্রার্থীদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর মধ্যে শিক্ষা , বিচারবুদ্ধি -বিচক্ষনতা ও সততাকে ভোটারগণ খুবই গুরুত্বপূর্ন মনে করেছেন। ব্যক্তিগত গুণাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা , নেতৃত্ব দানের গুণাবলীকে স্থানীয় নির্বাচন অপেক্ষা জাতীয় নির্বাচনে গ্রামীন জনগন অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। ভোটারগন এসম্পর্কে বলেছেন যে,জাতীয় নির্বাচনের মধ্যেমে নির্বচিত প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করে থাকেন। সুতরাং তাদের উপরোক্ত গুণাবলী দু'টি থাকা উচিত। আবার প্রার্থীর সততা , নাগরিক সংশ্লিষ্টতা গুণাবলীকে ভোটারগণ জাতীয় নির্বাচন অপেক্ষা স্থানীয় নির্বাচনে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্লেষণে দেখা গেছে এলাকার উন্নয়ন, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস দমন ও নিরাপত্তা প্রদান বিষয়গুলোকে ভোটরগণ খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রায় সকলে শান্তি- শৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস দমন এবং নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রার্থীকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। বর্তমানে মানুষের শাসক গোষ্ঠির তথা জনপ্রতিনিধির নিকট সর্বাপেক্ষা কাঙ্খিত বিষয় হচ্ছে নিরাপত্তা । কারণ মানুষ চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিনযাপন করছে। ভোটারগণ প্রায় সকলেই উত্তর দিয়েছেন, যারা নিরাপত্তা দিতে পারবে তাদেরকে তারা প্রতিনিধি হিসেবে দেখতে চান।

প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থীর ডেমোগ্রাফিক বিভিন্ন উপাদান (লিঙ্গ ,পেশা , বয়স , আয় ও অর্থনৈতিক অবস্থান) কে জনগণ কতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দেখা গেছে ডেমোগ্রাফিক উপাদানের মধ্যে লিঙ্গ বিবেচনায় অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণ প্রার্থী হিসেবে পুরুষকে প্রধান্য দিয়েছেন ।তবে সমাজের শিক্ষিত সচেতন অংশ প্রতিনিধি হিসেবে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন নারী বা পুরুষ যে কাউকে প্রতিনিধি হিসেবে বেছে নেন বলে উত্তর দিয়েছেন। প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থীর লিঙ্গ বিবেচনা করেন কি না এরূপ প্রশ্নের উত্তরে অনেক ভোটদাতা পুরুষকে প্রাধান্য দিলেও তারা বলেছেন যে, যেকোন পুরুষ প্রার্থীর চেয়ে তাদের নেত্রীকে (নিজ নিজ দলীয় আদর্শে) বেশি যোগ্য ও উপযুক্ত মনে করেন। এক্ষেত্রে তাদের প্রশ্নের উত্তরের সাথে মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৃষ্টির সমস্যা, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতির অনুপস্থিতি, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব এবং এর জন্য জাতীয় প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে যে অনুমান করা হয়েছিল তাও সঠিক প্রমানিত হয়েছে।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিশ্লেষনে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন সময়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সীমবদ্ধতার কারণে তা সম্ভব হয় নি । তবে ৯০ - এর পর থেকে বালাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রের একটি বিশেষ ধারা গড়ে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু এ ধারা অন্যান্য উন্নত সমাজের গণতন্ত্র ও গনতান্ত্রিক সংস্কৃতির মতো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি।

বর্তমান গবেষণায় গ্রামীণ জনগণের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিষয়টিকে বিভিণ্ন চলকের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত উপাত্ত গুলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গ্রামীন জনগনের রাজনৈতিক সহনশীলতার ক্ষেত্রে মধ্যম প্রকৃতির সহনশীলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তারা বিরোধীদল বা মতের প্রতি মোটামুটি শ্রদ্ধশীল। কিন্তু গ্রামীণ জনগণ বিরোধীকর্মকান্ডকে তেমনটা সমর্থন করেননা। সহনশীলতা পরিমাপের ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগণের রাজনৈতিক আচরণগত দিকটি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অধিকাংশের মধ্যেই রাজনৈতিক আলোচনায় উদাসীনতা রয়েছে। তবে শহরের সাথে যাদের কিছুটা যোগাযোগ আছে তারা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং এদের মধ্যে রজনৈতিক আচরণে

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যম প্রকৃতির সহনশীলতা পরিলক্ষিত । এক্ষত্রে শিক্ষা , আয় , পেশা এবং গণমাধ্যমের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে পাস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ বিষয়টিকে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা গেছে, গ্রামীন জনগনের অধিকাংশই সরকারের কর্মকান্ড ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল । কিন্তু স্থানীয় নেতৃত্ব বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নেতৃতের প্রতি গ্রামীণ জনগণের আস্থা(৩৭%) একেবারেই কম । নিরক্ষর এবং স্বল্প আয়ের উত্তরদাতাদের মধ্যে এ হার আরও কম। তারা স্থানীয় নেতৃত্বকে নেতিবাচকভাবে মুল্যায়ন করেছেন ।পারস্পরিক স্বাধীনতার প্রতি গ্রামীণ জনগনের ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য করা গেছে।বেশির ভাগ উত্তরদাতাই পারস্পরিক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন বলে উত্তর প্রদান করেছেন ।অন্যের রাজনৈতিক মতামতের প্রতি গুরুত্ব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিষয়টি গ্রামীণ জনগণের মধ্যে তেমন বিকশিত হয়নি। পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা, আয় , পেশা, বৈবাহিক অবস্থা ও গণমাধ্যমের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। পারস্পরিক সাহায্য সহোযোগিতার ক্ষেত্রে গ্রামীণ জনগনের মনোভাব বিশ্লেষণে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে।

সমাজ কিংবা রাষ্টীয় জীবনে সহযোগিতার বিষযটি যে একটি প্রয়োজনীয় উপাদান এ বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রবল। জাতীয় গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে গ্রামীণ জনগণের মতামত অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনগণের অধিকাংশই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে সমঝোতা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন । তাদের সমঝোতা ও ঐকমত্যের বিষয়টি বিভিন্ন ডেমোগ্রাফিক চলক দ্বারা প্রভাবিত হয়। তার মধ্যে শিক্ষা , আয়, পেশা, ধর্ম ,লিঙ্গ ও গণমাধ্যম অন্যতম। শাসন ব্যবস্থা পছন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় অধিকাংশ লোকই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পছন্দ করেন। কিন্তু গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তারা সুস্পষ্টভাবে মূল্যায়নে অক্ষম। অর্থাৎ গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও অধিকাংশ গ্রামীণ জনগণই গণতন্ত্রকামী । এক্ষেত্রে শিক্ষা ও পেশার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । গণতন্ত্র সম্পর্কে তাদের ধারণা অস্পষ্ট হলেও গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও মুল্যবোধের প্রতি গ্রামীণ জনগণের বিশ্বাস প্রবল। আইনের শাসন, নির্বাচন ইত্যাদির প্রতি তাদের আস্থা ও বিশ্বাস আছে। নাগরিক দায়িত্ব -কর্তব্য সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণের সচেতনতা ও তা সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে চিত্রটি পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, সবাই জানেন এবং মনে করেন যে একজন নাগরিক হিসেবে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে কিন্তু সে দায়িত্ব -কর্তব্যগুলো কি সে সম্পর্কে গ্রামীণ জনগণের ধারণা স্পষ্ট নয় । এক্ষেত্রে তারা একমাত্র ভোট প্রদানকেই নাগরিক দায়িত্ব -কর্তব্য বলে মনে করেন। অনেকে হয়ত নাগরিক দায়িত্ব- কর্তব্য পালনও করেন কিন্ত তা তারা বুঝতে পারেন না। নাগরিক দায়িত্ব -কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা ও সম্পাদনের ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা অগ্রগামী । সেই সাথে শিক্ষা, আয়, পেশা ও গণমাধ্যমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায় , গ্রামীণ জনগণ শুধুমাত্র ভোট প্রদানকেই রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মূখ্য বলে মনে করেন। সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হবার ক্ষেত্রে তাদের তেমন আগ্রহ নেই । তবে অধিকাংশ লোকই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক, না হয় সহানুভূতিশীল । মহিলাদের মধ্যে রাজনীতিতে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে বেশি ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রামীন জনগনগণের অংশগ্রহণ আশানুরুপ। কিন্তু রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ততা ও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক আলোচনার প্রতি গ্রামীন জনগণের সাড়া প্রদানের মাত্রা আশাব্যঞ্জক নয় । এর প্রতি তাদের কিছুটা উদাসীনতা প্রমাণিত হয়েছে।

গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করার পর অনুমিত বিষয়গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে সুশাসনের বাধাগুলো হচ্ছে-

রাজনৈতিক কৃষ্টি, শিক্ষার হার কম, ধর্মীয় প্রভার ও কুসংস্কার, রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত না থাকা, অনুন্নত যোগযোগ ব্যবস্থা, সীমিত প্রচার মাধ্যমের ব্যবহার, নেতৃত্বের সংকট, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতির অনুপস্থিতি, জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব ইত্যাদি।

সুশাসনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে যেমন - অংশগ্রহণ , আইনের শাসন , স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা ,নিরপেক্ষতা, দায়বদ্ধতা, শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা ইত্যাদি এ গুলোর অভাব রয়েছে বাংলাদেশে।

গবেষণা এলাকায় জরিপ চালাতে এ বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এছাড়া সুশাসনের যে উপাদান গুলো নিয়ে গবেষণা কর্মে আলোচনা করা হয়েছে যেমন - অবাধ,স্বাধীন,নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা, সংগঠিত হবার এবং অংশগ্রহণের স্বাধীনতা,সরকারী কাজের জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়গুলোর থেকে দেখা যাচ্ছে এই উপাদানগুলোর ঘাটতি এদেশে রয়েছে। আর বাংলদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম বাধা এই বিষয়গুলো। এই বাধাগুলো দুর করে স্বচ্ছতা , সরকারের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা জনগণের মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহের নিশ্চয়তা বিধান,আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা , যোগ্যতা ও মেধার ভিত্তিতে প্রশাসনিক পদে নিয়োগ নিশ্চিত করা,শক্তিশালী ও সুগঠিত জনসমাজ গঠন, জনগণের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণ ,সরকার গঠন, পরিবর্তন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

এছাড়াও জনগনের শিক্ষার হার বৃদ্ধি, জনগণকে অধিকার সচেতন করা , গড় আয় বৃদ্ধি, সনাতন পেশা ছেড়ে আধুনিক পেশায় আসতে জনগণকে উৎসাহ দান ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে । সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রচেষ্টায় এটি করা সম্ভব । সরকার সুদৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এ সমস্যা গুলো সমাধানে উদ্যোগী হতে পারে।